ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

পরশুরাম
শ্রীকরকমলেষু

ছেলেবেলা শুধু ছেঁড়া-ভাব আর খোঁড়া-ছন্দেরে টানি—
মিল খুঁজে-খুঁজে কবিতা রচিতে হইয়াছি হয়রাণি !
মানুষের মাঝে কত কৌতুক—তুমি যে ক্যামেরা ধরি,
দেখালে রঙীণ চশমা লাগায়ে, তাইত তোমারে স্মরি !
একলব্য যে গুরু-দ্রোণে দিল কাটি বৃদ্ধাঙ্গুলি—
'পরশুরামের' চরণে রাখিনু মন-গড়া ভুলগুলি !

বিনীত
স্বপনবুড়ো

আশ্বিন,
১৩৬০।

মুখবন্ধ

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'

সত্যি তাই! বঙ্গদেশ ভঙ্গ হয়েছে বটে, তবু তার রঙ্গ এতটুকু কমেনি, বরং আরও বেড়েছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্তও একথা হয়ত জানতেন না! বেঁচে থাক্‌লে অনেক কিছু নতুন করে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথও তাই কৌতুক করে বলেছিলেন—

"আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে
কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদ গন্ধ আমি ত পাই মৃদুমন্দ
আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।"

* * *

এই হাসির গল্পগুলি পড়ে পাঠক-পাঠিকারা হাস্‌বেন কিনা জানিনা, তবে একটি কথা আগে থেকেই স্বীকার করে রাখা ভালো যে, গল্পগুলি বয়স্কদের জন্যেই রচিত হয়েছে, ছোটদের জন্যে নয়।

আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক যে আন্তরিকতা নিয়ে তাড়াতাড়ি বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তা চিরদিন আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে। প্রকৃতপক্ষে এক মাসের মধ্যেই পুস্তকখানি মুদ্রণ-যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ করেছে। আজকের ডামাডোলের যুগে তাকে প্রায় রেকর্ড করা বলা যেতে পারে।

এই অবকাশে শিল্পী ধীরেন বলকেও আমার প্রীতি জানাই।

স্বপনবুড়ো

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৬০।

রঙ্গ-তালিকা

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী !

—নামটা ইতিমধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন—এবং পাঠক-পাঠিকাদের ভেতর অনেকেই এই বিশেষ নামটি জপমালা করে ফেলেছেন।

আর না হবেই বা কেন ?

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী বাঙলা দেশের নারী-পুরুষের মন নিয়ে যেন একেবারে ছিনিমিনি খেল্‌তে সুরু করে দিয়েছেন !

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন চমক্‌প্রদ নাম আর কোনো সাহিত্যিক করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কী চোখা-ভাষা আর রোখা-বুলি!

'কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিয়ে দেয়' বল্লে ভুল করা হবে···, বাস্তবকে অনুসরণ করে উক্তি করা চলে যে, চর্মের ভেতর দিয়ে যেন সূচিকাভরণ করে দেয়!

এ হেন ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর সভা-সমিতি থেকে ঘন-ঘন ডাক আসে। ইনি না গেলে কোনো সাহিত্য-সভাই নাকি জমে না! ত্রিপাঠীর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভাগৃহ গম্‌-গম্‌ করতে থাকে. তাঁর শ্লেষ আর বিদ্রূপে সবাই ভয়ে তটস্থ; তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত তীক্ষ্ণ বাক্যরাশি শাণিত তরবারির মতো মানুষের পুরাতন সংস্কার, জীর্ণ মত, আর বস্তা-পচা বুলিকে খণ্ড খণ্ড করে এগিয়ে চলে! শ্রোতা অবাক হয়ে ভাবে—উঃ! মানুষটার কি অগাধ পাণ্ডিত্য! চল্‌তি মত আর পথকে তুলোধূনো করে নিজের মন মত বিরাট সড়ক মুহূর্তে তৈরী করে দিয়ে চলে যান। তিনি প্রস্থান করলে তবে অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মুস্কিল এই যে, তাঁকে যেমন সবাই যমের মতো ভয় করেন—তেমনি তাঁকে বাদ দিলে কোনো সাহিত্য-সভাই জমে না। শিবহীন যজ্ঞের মতো তা শেষ পর্যন্ত 'দক্ষযজ্ঞে' পরিণত হয়!

তাই ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একাধারে ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে সভাপতিত্ব করে ফেরেন—শহরে, শহরতলীতে, মহকুমায়, গ্রামে আর মহানগরীতে!

খুব বেশী লঙ্কা আর পেঁয়াজ বাটা মেশানো তরকারী যেমন

লোকে চেয়ে-চেয়ে নিয়ে খায় এবং তারপর নাকের জলে, চোখের-জলে এক হয়ে ওঠে তেমনি ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীকে মানুষ ডেকে নিয়ে যায় বিভিন্ন অঞ্চলে, কিন্তু তারপরই তাঁর বাক্য-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মনে-মনে বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

তবু জনসাধারণের মনে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে—তারই ফলে যে মানুষটি জ্বালা দিয়ে কথা বলে, বিদ্রূপ করে, সমস্ত কিছু আয়োজনের একটা অকিঞ্চিৎকর অর্থ বের করে উৎসবকে পণ্ড করতে চায় তাকেই লোকে ঝাল তরকারির মতো বেশী করে চায় জিবের স্বাদের জন্যে! চোখের জল পড়ুক তাতে আপত্তি নেই, তবু জিবের ত' স্বোয়াদ হল।

তাই ত' সভা-সমিতি, সংস্কৃতি-কেন্দ্র, বারোয়ারী-তলার লোকেরা ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে যায়, মালা দেয় গলায়, অসীম পুলকে তীব্র বাক্যবানে বিদ্ধ হয়, তারপর নিজেদের খরচায় গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়!

অনুষ্ঠান অন্তে সাত দিন ধরে সেই অঞ্চলের লোকেরা বলাবলি করে, হ্যাঁ লোকটা শোনালে বটে! মরা-মানুষের চামড়াতেও জ্বালা ধরিয়ে দেয়!

বিদ্যুতের মধ্যে বজ্র আছে বলেই বুঝি লোকে তাকে এত বেশী ভয় করে। ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সভায় গিয়ে যত কড়া কথা শোনান তাঁর জনপ্রিয়তা তত বেশী বৃদ্ধি পায়—এটা নিছক অনুমান নয়, চোখে দেখা কথা।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর উপন্যাসগুলিও স্ত্রী-পুরুষের মনে স্নায়ুর-যুদ্ধ সুরু করিয়ে দেয়।

নানা বিচিত্র চরিত্র সেই উপন্যাসে ভীড় জমায়। প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার মনে কোন একটি চরিত্র তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে, এই মানুষটি হচ্ছ তুমি! তোমাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে, তারপর আঘাতে আঘাতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে—ধূলির সঙ্গে!

নিজের দেহ যতই কুৎসিত হোক—তাকে নানাভাবে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার যেমন একটা প্রলোভন মানুষের থাকে তেমনি ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর শাণিত লেখনীতে সে নিজে কিভাবে রূপলাভ করেছে সেটা দেখবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাঠক-পাঠিকা মহলে গোপনে বাসা বেঁধেছে। যতই তারা মনে-মনে আহত হোক, ত্রিপাঠীর উপন্যাস না পড়ে তাদের গত্যন্তর নেই। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পড়ে লুকিয়ে, শিক্ষক পড়েন ছাত্রদের আড়াল করে টিফিনের ঘণ্টায়, মহিলারা পাঠ করেন দুপ্রহরের সুখ-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে—আর অফিসের বাবুরা পড়েন—ডেস্কের ভেতর লেজার খাতায় লুকিয়ে।

এমন কাহিনীও ইদানিং শোনা গেছে যে, স্ত্রী পড়েন স্বামীকে লুকিয়ে এবং স্বামী পাঠ করেন স্ত্রীকে আড়াল করে। এইভাবে ত্রিপাঠীর উপন্যাস কত সুখের দাম্পত্য-জীবনকে যে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে—পশ্চিম বাঙলা সরকার হিসেব রাখলে দেখতে পারতেন যে, তার সংখ্যা নগণ্য ত' নয়ই বরং ক্রমবর্ধমান!

ত্রিপাঠীর উপন্যাস প্রকাশের জন্য প্রকাশক মহলে একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রকাশকই 'রয়ালটি'র মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আর প্রলোভন দেখাচ্ছেন,

আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেবেন না স্যার! এমন 'গেট-আপ্' করে উপন্যাস ছাপবো যে, লোকের দেখে তাক্ লেগে যাবে!

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী মনে-মনে মুচ্‌কি হাসেন আর কলমের ডগায় আরো বেশী ধানী লঙ্কার গুড়ো মেশান।

ত্রৈলোক্য তাঁর নিজের অঞ্চলে শনি-ঠাকুরের মতো একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছেন। প্রতিবেশিনী, প্রতিবেশীরা ভাবেন—তাঁদের সবাইকে অপরূপ রূপসজ্জায় সাজিয়ে তিনি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করেন! কাজেই কেউ তাঁর সঙ্গে মন-খুলে কথা কইতে রাজি নন্। অথচ তাঁদের পাড়ায় ত্রৈলোক্য বাস করেন এটাও সকলের গর্বের বিষয়।

এই বিপরীতমুখী মনোভাব নিয়ে ত্রৈলোক্যের প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনী দল সর্বদাই হাসি আর অশ্রু-সায়রে দোলায়মান!

ত্রিপাঠী ঠিক করে নিয়েছেন—ভালো হোক—মন্দ হোক, মাঝারি হোক—প্রত্যহ তিন ফর্মা পরিমাণ লেখা তাঁকে প্রসব করতেই হবে। নইলে প্রকাশক মহলের চাহিদা মেটানো শক্ত! ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা যেমন রচনায় হাত মক্স করে, ত্রিপাঠী তেমনি সকাল-সন্ধ্যেয় খাতা পেন্সিলের সঙ্গে সমর সুরু করে দেন। যতবেশী লেখেন তারও অধিক লেখনী-আন্দোলন করেন। লিখ্‌তে লিখ্‌তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুইটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মহাশূন্যে কার বিরুদ্ধে আস্ফালন জানান।

ত্রিপাঠীর বাড়ীর আশে-পাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা এই সময়টায় ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করেন—লেখকের ভাবাবেগের ছবি 'স্ন্যাপ্ সটে' তুলে নেবার জন্যে; এগুলি দেশের সাপ্তাহিক ও সিনেমার

কাগজগুলি টীকা-টিপ্পনী সমেত প্রকাশ করে। তার ফলে আলোকচিত্র-গ্রহণকারীর বেশ কিছু লাভ হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একটি নতুন ধরণের মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাসে সবে হাত দিয়েছেন, এমন সময় বাইরের ঘরের কড়া ঘন ঘন শব্দিত হয়ে উঠল।

বাড়ীতে তখন কেউ নেই, চাকরটাকে পাঠানো হয়েছে সিগারেট কেনবার জন্যে। ঘন ঘন ধোঁয়া না ছাড়লে ত্রিপাঠীর লেখা নাকি ভালো জমে না। কাজেই তাঁর টেবিলের ওপর থরে-থরে সাজানো থাকে নানা স্বাদের ও বিচিত্র গন্ধের সিগার-সিগারেট। যখন ভাবাবেগ সপ্তমে গিয়ে পৌঁছয় ত্রিপাঠী চক্ষু মুদ্রিত করে তখন কেবল বিড়ি টান্‌তে থাকেন।

নাঃ! কড়া নাড়ার শব্দটা ক্রমশঃ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। ত্রৈলোক্য চটি পায় দিয়ে দোতলা থেকে ফট্‌ফট্‌ করতে করতে নেমে এলেন একতলায় বস্‌বার ঘরে। হুড়কো খুলে দিতেই পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি ভদ্রলোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ত্রৈলোক্য প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেলেন। চোর-ছ্যাঁচড় নয় ত! আজকাল কলকাতা শহরের যা কাণ্ড-কারখানা হয়ে উঠছে—কাউকেই বিশ্বাস নেই।

মুখ দেখেই লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করতে পারেন বলে ত্রিপাঠীর একটা প্রকাণ্ড দাম্ভিকতা আছে। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই সবাইকার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিলেন।

নাঃ! মারাত্মক তেমন কিছু নয়।

সকলকার মুখে-চোখেই একটা 'বশম্বদ' বিনীতভাব যেন লেগে রয়েছে।

আশ্বস্ত হয়ে তিনি সবাইকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি তাঁদের প্রয়োজন।

পল্লীবাসীদের মধ্যে একজন শহরাঞ্চলে থেকে চাকরী-বাকরী করেন এবং কলকাতার একটি মেসে অবস্থান করেন। তিনিই মুখপাত্র হিসেবে কথা সুরু করলেনঃ আজ্ঞে, আমরা বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি—

ত্রৈলোক্য মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, আমিই ত্রিপাঠী, আপনাদের কি দরকার আমাকে বলতে পারেন।

সবাই সবিনয়ে ত্রিপাঠীকে নমস্কার জানালেন। মুখপাত্র বল্লেন, দেখুন, আমরা গ্রামাঞ্চলের লোক। সেখানকার লোকে শুধু আপনার নামই জানে কিন্তু সাম্‌না-সাম্‌নি দেখে জীবন সার্থক করতে পারে না! তাই আমরা এক বিরাট সাহিত্য-সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে গিয়ে পৌরোহিত্য করতে হবে।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর হঠাৎ কি মনে হতে জবাব দিলেন, দেখুন, শহর অঞ্চলেই আমাকে বেশী সভাপতিত্ব করতে হয়। পল্লীর লোক যে আমার বই পড়ে সেটা জানা ছিল না। শুনে আনন্দিত হলাম।

ভদ্রলোক বিনয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে কইলেন, আজ্ঞে আপনি বল্‌ছেন কি! আপনার লেখা বই পল্লী অঞ্চলের লোকেরা পড়ে না এ আপনি মনেও স্থান দেবেন না! লোকে রামায়ণ-মহাভারত ফেলে দু'বেলা আপনার বই কণ্ঠস্থ করছে! আমাদের লাইব্রেরীতে প্রতি মাসে আপনার বই কেনা হয়।

এই মুখরোচক বার্তা শুনে ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সত্যি পুলকিত হয়ে উঠলেন, বল্লেন, সত্যি, শহরে বাস করে গ্রামকে আমি প্রায় ভুলতেই বসেছি। পল্লী অঞ্চলে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছে করে বৈ কি!

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আজ্ঞে আমাদের গাঁয়ে আপনার মতো লোকের পায়ের ধূলো পড়লে সত্যি আমরা ধন্য হয়ে যাবো। এই সাহিত্য-সভায় আপনাকে অবিশ্যি করে যেতে হবে।

কলকাতার রেশনের চাল আর আটা খেয়ে ত্রিপাঠীর মন-মেজাজ বিষিয়ে উঠেছিল। মনে-মনে ভাবলেন, গ্রাম দেশে গিয়ে যদি অন্তত দু' দিনও খাঁটি জিনিস খেতে পান তবে দাঁত আর পেট নিশ্চয়ই বেশ আরাম বোধ করবে। তাই রসিকতা করে শুধোলেন, আপনাদের গাঁয়ে খাঁটি দুধ-ঘি মিলবে ত?

মুখপাত্র এইবার উৎসাহে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। জিবে যতদূর সম্ভব জল এনে, গলাটি মোলায়েম করে জবাব দিলেন, আজ্ঞে, সে কথা আর আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না। আপনার সেবার ভার নেবার জন্যে গাঁয়ের লোক উৎসুক হয়ে আছে। ক্ষেতের ধানের সরু চাল, পুকুরের মাছ, বাগানের টাট্‌কা তাজা শাক সব্জী শহরের লোক আপনারা যাকে 'ভিটামিন' বলেন, এছাড়া কচি নধর পাঁটা, বাড়ীর বৌ-ঝিদের তৈরী খাঁটি গাওয়া ঘি, গোয়ালের গাইয়ের ঘন দুধের পায়েস, ছানা যা আপনি হুকুম করবেন—

দীর্ঘ তালিকা শুন্‌তে শুন্‌তে ত্রিপাঠীর রসনাও লালা-সিক্ত হয়ে উঠেছিল। বল্লেন, ব্যস্‌! ব্যস্‌! যা' ফিরিস্তি আপনি দিলেন—তাতে সভাপতির ভাষণটা বিশেষ মুখরোচক হবে বলেই মনে হচ্ছে—

সম্মতি লাভ করে পল্লী অঞ্চলের লোকেরা খুশী মনে মুখপাত্রের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

সেদিন রাত্রে ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর নতুন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ আর ভালো করে জমে উঠতে পারল না। তাঁর মনে রসালো খাদ্যগুলি কেবলি আনাগোনা করতে লাগলো, এবং তিনি ইজি চেয়ারে শুয়ে জিব নেড়ে, মুখ চট্‌কে থেকে থেকে তাদেরই ধ্যান করতে লাগলেন!

যথাসময়ে সাহিত্য-সভার নির্ধারিত দিন এসে উপস্থিত হল। দুপুরবেলা সেই মুখপাত্র ভদ্রলোকটি ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন।

আজ ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একটু বিশেষভাবে সাজ-সজ্জা করেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শরীরকে একটু আয়েস দিতে হয়। অনেকদিন বাদে বাঙ্‌লার পল্লী অঞ্চলে যাচ্ছেন, অনেক কিছু মনের খোরাক পাবেন, বহু বিচিত্র ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবে, তাতে প্রচুর রসদ তিনি পাবেন সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূলে! আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি, পাম্প স্যু—সেটা এত বেশী চক্‌চকে করা হয়েছে যে নীচু হ'লে দিব্যি আয়নার কাজ করে, মানে মুখ দেখা যায়। ফিনফিনে উড়নী জড়িয়ে নিয়েছেন আদ্দির পাঞ্জাবীর ওপর। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে বেশ বোঝা যাবে যে, তিনি 'সেন্ট' মাখ্‌তেও ভুল করেন নি।

ত্রিপাঠী-গৃহিণী রসিকতা করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ফোঁড়ন দিলেন, এই বয়সে যে ভাবে নব-কার্তিকটি সেজে যাচ্ছো—দেখো, আবার ভুল করে আমার জন্যে একটি সতীন যোগাড় করে এনো না!

ত্রিপাঠীও কৌতুক কণ্ঠে জবাব দিলেন, শহরের মেয়ের সঙ্গে ত' অনেকদিন প্রেমালাপ করা গেল, এখন পল্লী-বালার পাণিপীড়ন করলে দোষ কি? নতুন প্রেরণা হয়ত সেই অনাঘ্রাতা পুষ্পই দিতে পারবে।

ত্রিপাঠী গৃহিণীও ছাড়বার পাত্রী নন। বল্লেন, সেই পল্লী-বালা-রূপ পুষ্পে কীটও ত' থাকতে পারে! খুব বুঝে-শুনে আঘ্রাণের চেষ্টা করো।

রস আর কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী 'সভাপতির অভিভাষণ' পকেটে নিয়ে মুখপাত্রের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

এমন অভিভাষণ তিনি রচনা করেছেন—যা শুনে পল্লী অধিবাসীরা স্তব্ধ হয়ে থাক্‌বে—মানে তাঁকে আরো বেশী ভয়-ভক্তি করতে শিখবে।

ত্রৈলোক্য জিজ্ঞেস করলেন, কোন মেইলে আমরা যাবো? মুখপাত্র সবিনয়ে জবাব দিলেন, আজ্ঞে মেইল কোথা পাবো আমরা? 'মার্টিন' লাইনেই আমাদের যাতায়াত। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক হতে পারি কিন্তু আদর আপ্যায়নে আমাদের কিছুমাত্র ত্রুটি ধরতে পারবেন না। মার্টিন লাইনের কথা শুনে ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর মনটা একটু দমে গেলেও দুধ-ঘি, মাছ-মাংসের আশায় বেশ খানিকটা চাঙা হবার চেষ্টা করলেন।

প্রথম শ্রেণী হলে কি হবে? একেবারে ছারপোকার ডিপো। আর এমন একটা বদ্ শুঁট্‌কি মাছের গন্ধ গাড়ীর ভেতর থেকে বেরুচ্ছে যে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত উঠে আসবার উপক্রম হল!

কিন্তু তিনি সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন—বিচলিত

তাঁকে হলে চল্‌বে না! বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলাই ত' সত্যিকারের জীবন! তবু মনটা থেকে থেকে খুঁত-খুঁত করে করে উঠ্‌ল যে, আদ্দির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরী ধুতি না পরে এলেই হত!

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলে যাচ্ছে—অদ্ভুত তাদের নাম। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। বহুকাল পরে তিনি পল্লী-অঞ্চলে যাচ্ছেন—, কী ভাবে সেখানকার লোকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে, কে তার গলায় মালা পরিয়ে দেবে, কোন ধনবান গৃহস্থের গৃহে তাঁকে সবাই তুলবে— চোখ বন্ধ করে তিনি সেই সবই আপন মনে ছবি এঁকে যাচ্ছিলেন। এইভাবে কত সময় যে কেটে গেছে সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও হুঁস ছিল না।

হঠাৎ মুখপাত্রের বিনীত আহ্বানে তার চমক ভেঙে গেল, তিনি আত্মস্থ হয়ে চোখ মেলে উঠে বস্‌লেন।

—আজ্ঞে, এইবার আস্‌ছে আমাদের ষ্টেশন—আপনি তৈরী হয়ে নিন্‌—মুখ ব্যাদান করে মুখপাত্র জানালেন।

—ষ্টেশনের নাম কি? আলস্যভরে জিজ্ঞেস করলেন ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী।

—আজ্ঞে 'নাকে-দড়ি'—ঠিক আগেরই মতো একান্ত অনুগত বশম্বদের ন্যায় উত্তর দিলেন মুখপাত্র।

এইবার চম্‌কে উঠ্‌লেন ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী।

চোখ দুটো বড় বড় করে শুধালেন, নাকে-দড়ি? কৈ সে কথা ত' আপনি আমাকে আগে জানান নি!

অধিকতর বিনয়ের ভাণ করে মাথাটা নুইয়ে মুখপাত্র জবাব

দিলেন, আজ্ঞে, আপনি ত' আমাদের গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করেন নি!

—তা বটে! ত্রিপাঠী ভাবিত হয়ে পড়লেন। অত্যধিক ধূম উদ্গীরণ করে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে গাড়ী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে নাকে-দড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হল।

হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখা একদল ছেলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চীৎকার করছিল "ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী কী জয়!"

ত্রিপাঠী শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি আপনাদের? হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে এরা সাহিত্য-সভা করবে নাকি?

মুখপাত্র মুখে স্মিত হাসি টেনে জবাব দিলেন, আজ্ঞে সাহিত্য-সভা ত' নয়, ফুটবল খেলা! আর খানিকক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কি না—পাড়া-গাঁয়ের রাস্তা—বুঝতেই পারছেন!

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন!—সাহিত্য-সভা নয়, ফুটবল খেলা। তা আমি কি করবো! আমায় কেন মিছিমিছি টেনে নিয়ে এলেন এখানে?

—আজ্ঞে আপনাকেই ত' রেফারীগিরি করতে হবে! নামকরা লোক না হলে ছেলেদের মন উঠে না! অথচ এই পাড়া গাঁয়ে কেউ আস্‌তে রাজি হয় না। তাই বাধ্য হয়ে সাহিত্য-সভার নাম করে আপনাকে নিয়ে এসেছি। আমার অপরাধ নেবেন না স্যার! কল্‌কাতায় থেকে চাকরি করি বলে গাঁয়ের ছেলেরা সবাই আমাকেই মুখপাত্র ঠিক করেছে। তাই নিজের একটা বুদ্ধির ক্যারামতি দেখিয়ে দিলাম!

হি-হি শব্দে মুখপাত্র তাঁর সাম্নে বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত করে হাসতে লাগলেন।

ত্রিপাঠীর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল। তিনি দেশের মানুষকে শ্লেষ-বিদ্রূপ করে কোণ্ঠাসা করে রাখেন আর সামান্য অজ-পাড়াগাঁয়ের এক বিকৃত-বদন-ব্যক্তি তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে!

চোখ পাকিয়ে ত্রিপাঠী হুংকার দিয়ে বল্লেন, আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়বো না!

বিনীত ভাবে হাত কচ্লে মুখপাত্র বল্লেন, দেখুন, ত্রিপাঠী মশাই, এখন আমাদের রাজ্যে এসে পড়েছেন—বেশী ট্যাঁ-ফোঁ করলে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্বো, কাক-পক্ষীতেও জান্তে পারবে না। তাই বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে যা বলছি শান্ত-শিষ্ঠ সুবোধ ছেলের মতো করে যান। প্রাণে বাঁচবেন, আর আপনার সম্মানও বজায় থাক্বে।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, ইতিমধ্যে সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আস্ছে। দূরে শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে প্লাটফর্ম থেকে ছেলের দল চীৎকার করে উঠল, নেমে আসুন ত্রিপাঠী মশাই, আমরা আপনাকে কাঁধে করে মাঠে নিয়ে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে ছুটে এসে তাঁর গলায় একটি জবা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। মনে হল, আদ্দির পাঞ্জাবীতে জবা ফুলের দাগ লেগে তার শুভ্রত্বে কলঙ্কের কালিমা এঁকে দিলে!

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী নিজেকে অত্যন্ত বিড়ম্বিত বলে মনে করলেন। কথায় বলে "পড়েছ যবনের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে।"

আপত্তি করে কোনো লাভ নেই—তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেলেদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

তারা নীচে দল বেঁধে এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। ছু'জন জাঁদরেল ছেলে এক ঝাকুনীতে তাঁকে কাঁধের ওপর তুলে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই আকাশ ফাটা চীৎকার করে উঠল—"ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী জিন্দাবাদ!" কয়েকটি ছেলে আবার দূর থেকে শিবা-কণ্ঠে জিগির দিলে—"বল হরি—হরিবোল!"

ত্রিপাঠী মশায়ের তখন গৃহিনীর রসিকতার কথা মনে পড়ে গেল,—সেই সতীন জোগাড় করে নিয়ে যাবার কথা!

কিন্তু এ যে একেবারে পাণ্ডব-বর্জিত দেশে গঙ্গা যাত্রার আয়োজন!

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর মনে যে আলোড়নই জাগুক, ছেলেদের উৎসাহ তার চাইতে অনেক বেশী। তারা হুম্-মুম্ শব্দে তাঁকে একেবারে খেলার মাঠে নিয়ে ধপাস্ করে নামিয়ে দিয়ে। খানিকটা কাদা ছিটকে উঠে ত্রিপাঠীর মুখে-চোখে লেগে গেল—কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাবল্যে সে ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী চেয়ে দেখলেন, মাঠে কাদা-জল থৈ-থৈ করছে, আর কতকগুলি ছেলে উন্মাদের মতো তারই মধ্যে ছুটোছুটি সুরু করে দিয়েছে।

মুখপাত্রের বিনীত ভাবটা আবার ফিরে এসেছে। তিনি ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্যের সম্মুখীন হয়ে বল্লেন, আজ্ঞে, এর পর বড্ড অন্ধকার হয়ে যাবে—আপনি খেলাটি সুরু করিয়ে দিন।

ত্রৈলোক্য বুঝলেন, আপত্তি জানিয়ে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলেন, ফুটবল ম্যাচ ত' হবে—কিন্তু বল কোথায় তোমাদের?

পরম উৎসাহে কয়েকটি ছেলে ছুটে গিয়ে গোটা কয়েক বাতাবী লেবু এনে মাঠের মাঝখানে ফেলে দিলে; বল্লে, আমাদের কিন্তু শহরের মতো গাঁটের কড়ি খরচ করে ফুটবল কিনতে হয় না। গাছে ফলে আমাদের বল; যত খুশী খেলো, আবার ফেটে গেলে তক্ষুনি বদ্‌লে নেয়া চলে।

ত্রিপাঠী আবার বুঝলেন, তিনি তাঁর লেখনীতে যতই ঝাল মেশান এখানে তাঁর জারিজুরি একেবারেই খাটবে না। প্রতিবাদ করে কথা বলতে গেলে গাট্টা খেতে হবে! সুতরাং সর্বনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক ছেড়ে দেয়াই পণ্ডিতের উপদেশ!

তিনি যদি গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরী ধুতির মায়া করতে যান তবে প্রাণ তাঁর থাকবে না। ইতিমধ্যে চক্‌চকে পাম্পস্যুর দশা যে কী হয়েছে সেটা আড় চোখে একবার দেখে নিয়েছেন।

মুখপাত্র বল্লেন, মালকোঁচা মেরে নিন্ ত্রিপাঠী মশাই, নইলে সারা মাঠে আপনি রেফারী হয়ে ছুটোছুটি করবেন কি করে?

মুখপাত্রের দিকে ত্রিপাঠী একবার তাকালেন। আগেকার মুনি-ঋষির মতো তাঁর যদি ভস্ম করবার ক্ষমতা থাকতো তবে মুখপাত্র এক গাদা ছাইয়ে পরিণত হয়ে যেতেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না,—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সত্যি সত্যি মালকোঁচা মেরে কাদায় ভরা মাঠে বাতাবি লেবুর ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেফারি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন!

যেখানে-সেখানে কাদা গোলার মধ্যে বাতাবি লেবু এসে পড়ে আর ত্রিপাঠী মশায়ের যে মূর্তি হয় তা দেখলে তাঁর যে কোনো ভক্ত একেবারে মূর্ছা যেতো! কিন্তু এখানে খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার কিংবা ক্যামেরাম্যান নেই যে, বিবরণী দেবে—বা ফটো তুলে নেবে!

সুতরাং ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একেবারে প্রাণপণে রেফারী হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন—একবার একটি 'পেনালটি সট্' ছুটে গিয়ে ঘোষণা করতে গিয়ে যাকে বলে একেবারে পা পিছলে আলুর দম!

'হাফ টাইম' হতে সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। ছেলেরা বল্লে ত্রিপাঠী মশাই, দুটো লেবু খান, আপনি গোটা মাঠটা ছুটোছুটি করেছেন!

লেবু না খেতে বলে যদি খাবি খেতে বলা হত তাহলেই বোধ করি সত্যকারের বুদ্ধিমানের কাজ করা হত। ত্রিপাঠী মশাই কাষ্ঠ-হাসি হেসে জবাব দিলেন, কিছুই খেতে হবে না ভাই! তোমাদের সঙ্গে মাঠে নেমে যে প্রেরণা পাচ্ছি তা আমি ভাষায় জানাতে পারবো না! মনে হচ্ছে—যেন আবার হারানো ছেলেবেলা ফিরে পেয়েছি!

ছেলেরা প্রবল উত্তেজনায় জয়ধ্বনি করে উঠল, "জয় ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর জয়!" মাঠের কাদা ছিটিয়ে সমবেত জনতা সেই জয়-ধ্বনির সমর্থন জানালো।

দুটি পাশাপাশি গ্রামের টিমের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছিল। একপক্ষ যদি গোল দেয় তবে অন্যপক্ষের সমর্থক দল রেফারীর মাথা ভাঙতে কিম্বা ঠ্যাং খোঁড়া করতে ছুটে আসে!

অতি সাবধানে ত্রিপাঠী মশাই ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে তাকিয়ে গুরু-দায়িত্ব সমাধা করতে লাগলেন। কোনো উপন্যাসে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করবার ব্যাপারেও তাঁকে এত বেশী মাথা ঘামাতে হয় নি! আর যাই হোক পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে ত'! নইলে যে গৃহিণীর হাতের নোয়া আর শাঁখা কোনো মতেই অক্ষুণ্ণ থাকবে না। নিজের জন্য না হোক তাঁর স্ত্রীর জন্যেই তাঁকে জীবন ধারণ করতে হবে। বেচারীর আবার মৎস্যহীন-অন্ন মুখে রোচে না! হায় নারি, তুমি যদি জানতে যে কোথায় ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন তা হলে বৃন্দাবনের রাধার মতো তাঁর ট্যাক্সির টায়ার ধরে পড়ে থাক্‌তে, কিছুতেই ষ্টেশনের দিকে এগুতে দিতে না!

বাঙলা দেশের খ্যাতনামা লেখক ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর চোখের জল 'নাকে দড়ি' গ্রামের কাদা ভরা মাঠে ঝরে পড়ল, ইতিহাসে তার কোনো সাক্ষ্যই আর রইল না!

যে লেখক হাজার হাজার পাঠককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে চোখের জল ফেলতে বাধ্য করছেন—তাঁর আজ এই দশা!

একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ!

তবু ত্রিপাঠী মশায়ের ধৈর্যের প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, এখানে মাথা ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন, নইলে পাড়াগাঁয়ের ডাণ্ডার কাছে মাথার মায়া একেবারে ত্যাগ করতে হবে।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর ভাগ্য ভালো বলতে হবে। দুই পক্ষই দুটি করে গোল খেয়েছে। কেউ আর শেষ পর্যন্ত শোধ দিয়ে খেলার গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে পারল না।

যে কোন একটি পক্ষ যদি জয়লাভ করত—তবে বিজিত পক্ষ এসে যে ত্রিপাঠী মশায়ের মাথা ভেঙে দিত সে বিষয়ে সন্দেহের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

কিন্তু সমান ফল হওয়ায় ত্রিপাঠী মশায়ের আদর দুই দলের কাছে অব্যাহত থাক্‌ল এবং দুটি দলই তাঁকে টানাটানি করতে লাগলো খাওয়ার জন্যে।

গ্রামের মুখপাত্র মশাই খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে মিথ্যে গুমোর করেন নি। খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জল খাবারের যে আয়োজন চোখে পড়ল তা দেখে কল্‌কাতার রেশনের মানুষ ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর চোখ দুটি একেবারে গোলালু হয়ে উঠ্‌ল!

বাগানের বহুবিধ ফল—আর সেই সঙ্গে ছানার পায়েস থেকে সুরু করে বহুরকম ঘরে তৈরী মিষ্টি।

ঔপন্যাসিক মশাই মনে মনে ভাবলেন, এই মুখরোচক পদার্থগুলি পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গেলে মন্দ হত না! তবু এতক্ষণ ধরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সারা মাঠ চষে তাঁর ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব, সুতরাং বেশী বাক্য-ব্যয় না করে ডানহাতের কাজ বেশ ভালোভাবেই সুরু করে দিলেন।

রাত্তিরে আবার দুইদলে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল—'রেফারী' কোথায় নৈশ-ভোগ সমাপ্ত করবেন—তাই নিয়ে। একদল যদি বলে, আমরা পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধরিয়েছি—অমনি অপর পক্ষ হুংকার দিয়ে ওঠে, আমাদের পাঁটা কাটা হয়ে গেছে! কথা কাটাকাটি থেকেই হাত গুটোনো—তারপরই প্রায় ঘুষোঘুষি সুরু হয় আর কি! ত্রিপাঠী মশাই মাঝখানে পড়ে বল্লেন, দু' দলের রান্নাই এক জায়গায় বসে খাবো,—কারো কোনো ক্ষোভ রাখবো না। প্রাণ যদি যায় তবে খেয়েই যাক্।

দুই দল তখন মহা খুশী!

কল্‌কাতায় ফিরে এসেই ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একটি বিবৃতি সব কাগজে পাঠিয়ে দিলেন। ছাপা হলে দেখা গেল—তাঁর বিবৃতিটি এই রকম:

বাঙলা দেশে সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সকলেরই অল্প-বিস্তর অর্থাগম হয়; সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে দপ্তরীও তাঁর পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। কিন্তু স্রষ্টা-সাহিত্যিক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিয়ে

কিংবা সভাপতিত্ব করে একটি কানাকড়িও লাভ করতে পারেন না। তাই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি যে, আজ থেকে প্রতি সভায় সভাপতিত্বের জন্যে নগদ ১০১৲ টাকা দক্ষিণা গ্রহণ করবো। ডাক্তার যদি ফী নিতে পারেন, সাহিত্যিক কি দোষ করলেন তা আমি বুঝতে পারি না! তাঁর সময়ের মূল্য আরো বেশী। আরো একটি জরুরী ঘোষণা আছে। পল্লী-অঞ্চলে সভাপতিত্ব করতে হলে সেই প্রতিষ্ঠান সাহিত্যিকের জীবন-বীমা করতে বাধ্য থাকবেন। বলাবাহুল্য প্রিমিয়াম উক্ত প্রতিষ্ঠানকেই যোগাতে হবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

ঘোষণাকারী—
শ্রীত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী
(সাহিত্য ধূরন্ধর)

তিসির কারবারী হরিহর ভাণ্ডারী যখন বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করলেন, পাড়ার পাঁচজন বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন বলেই মনে হল।

হরিহরবাবু সারাজীবন ব্যবসা চালিয়ে টাকা জমিয়েছেন যেমন প্রচুর, তেমনি তাঁর বয়সেরও গাছপাথর ছিল না। পাড়ার

মাতব্বরেরা সাম্‌নে খাতির করত, আর আড়ালে-আবডালে বলত, বুড়ো অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে এসে যখের ধন আগলাচ্ছে। মরলে যে শ্রাদ্ধে ভরপেট লুচি-মণ্ডা খাবো—তার কোন হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই হরিহরবাবু যখন স্বাধীনতা দিবসে নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে চিত্রগুপ্তের কাছে সারা জীবনের হিসেব-নিকেশ দিতে চলে গেলেন তখন একজন বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে অভিমত প্রকাশ করলেন—আহা! স্বাধীনতার হাওয়া ভদ্রলোকের সইল না। একে প্রচুর টাকার গরম তায় স্বাধীনতার উত্তাপ, হরিহরকে পটল তুল্‌তেই হল।

হরিহরের একমাত্র ছেলের নাম হচ্ছে রামহর। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, রামহর ম্যাট্রিক পাশ করে মাস ছয়েক কলেজে যাতায়াত করেই স্থির করে ফেল্‌ল যে 'রামহর' নামটি অতি সেকেলে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন জানিয়ে সে রাতারাতি সেই পচা পুরানো সেকেলে নামটি পরিবর্তন ক'রে নিজের নতুন নামকরণ করলে 'ঝিলিক্'।

হরিহরের মৃত্যুর পর ঝিলিক ভাণ্ডারী পাড়ার 'হিরো' হয়ে উঠল।

পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গোৎসব হবে—ঝিলিক ভাণ্ডারী তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। পাড়ার ছেলেরা অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় গড়বে—ঝিলিক ভাণ্ডারী তার পরিচালক ; এতদিন সেই অঞ্চলে যে পাঠশালাটা টিম্‌টিম্ করছিল—বুদ্ধিমান পণ্ডিতমশাই একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে ঝিলিককে তার সেক্রেটারী করে দিয়ে

এলেন। অন্ততঃ মাস গেলে পণ্ডিতমশাই নিজের মাইনেটা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

এমনি ভাবে সকল দিক থেকে সবাই মিলে যখন ঝিলিকের তরুণ মস্তিষ্ক চর্বণ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল—ঝিলিকের ছোটমামা বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন এসে তার দিদিকে বোঝালে যে, ভাণ্ডারীমশাই পরিণত বয়েসেই পরলোকের ডাকে চলে গেছেন—সেজন্য শোক করবার কিছু নেই। কিন্তু সাত-ভূতে মিলে তার ভাগ্নের কচি মাথাটা যে চিবিয়ে খাবে সেটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। আর সেইজন্য সে তার সমস্ত কাজ-কর্ম আর ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে দিদির এই বিপদে না এসে থাকতে পারে নি।

সত্যি কথা বলতে কি, বাপের মৃত্যুর পর থেকে ঝিলিক যে ভাবে দু'হাতে টাকাগুলি 'নয়-ছয়' করছিল তাতে ঝিলিকের মা বিশেষ শঙ্কিতই হয়ে পড়েছিলেন। এখন ভাইকে নিজের পাশে দেখে আকাশের চাঁদ যেন হাতের মুঠোয় খুঁজে পেলেন।

—বৃন্দাবন এসে পড়েছে, এখন সেই আমাদের ভরাডুবি থেকে বাঁচাবে—এই রকম একটা ভাব হরিহর গৃহিণীর মুখে ফুটে উঠ্‌ল।

দিদিকে নিশ্চিন্ত করে বৃন্দাবন ভাগ্নের খোঁজে বৈঠকখানায় এসে হাজির হল।

বয়েস হতেই ভাণ্ডারী মশাই অবশ্য কারবার গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কেননা, নিজের হাতে অপর কেউ এসে তামাক খেয়ে যাক্ এটা তিনি আপদেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর

সঞ্চিত অর্থ যে ক্রমাগত ছা-পো বিয়িয়ে চল্‌ছিল সে কথা কারো অজানা ছিল না!

দান-ধ্যান করাটাকে তিনি অপব্যয় বলেই মনে করতেন ; তার ভ্রূভঙ্গিকে ভয় করে ভিখিরী-বষ্টুমেরা বাড়ীর ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না! এহেন ভাণ্ডারী মশায়ের বৈঠকখানা এখন বঙ্কিমী ভাষায়—"কাক-সমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় সর্বদা শব্দিত হচ্ছিল।"

বৃন্দাবন দু'দিন ভাগ্নের মজলিসে যোগদান করে বুঝতে পারল যে, ভাগ্নের প্রকৃত 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' হচ্ছে—চঞ্চল বলে একটি ছেলে—শ্রীমানেরই কলেজের সহাধ্যায়ী।

বিভিন্নমুখী আলোচনায় মজলিস-কক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

আলোচনার বিষয়—রেশন, মন্ত্রিমণ্ডলী, সিনেমা, মোহনবাগান, দাঙ্গা থেকে সুরু করে সুদূর ষ্ট্যালিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন্ দিন যে কোন্ বিষয় প্রাধান্য লাভ করবে সেটা আগে থেকে বলা শক্ত। আবহাওয়া-ঘোষণাকারীদের ভবিষ্যৎ-বাণীকে ব্যর্থ করে দিয়ে ঝড়-বৃষ্টির রাস্তা যেমন অন্য দিকে ধাবিত হয়, ঠিক সেই রকম এই মজলিসের আলোচ্য বিষয়ের 'ব্যারোমিটার' কোনো আইন-কানুন না মেনে অকারণেই ওঠা-পড়া করতে থাকে।

বুদ্ধিমান বৃন্দাবন বুঝতে পারল যে, এই 'ব্যারোমিটার'কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সকলের আগে। চঞ্চলকে হস্তগত করতে হবে।

কাজেই ভাগ্নেকে আয়ত্তে আনবার আগে চঞ্চলের সঙ্গে সে গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে ফেল্লে।

প্রতিদিনকার মজলিসে যে ধূমায়িত চা আর তপ্ত চপ্-কাট্‌লেট্

সরবরাহ করা হয়—তার আদেশ দেবার মালিক হচ্ছে—চঞ্চল। কাজেই ভাগ্নের মজলিসের দাবা খেলায় শ্রীমান চঞ্চল হচ্ছে আসল 'মন্ত্রী'। এই মন্ত্রীটিকে সর্বাগ্রে হস্তগত করা দরকার।

বৃন্দাবন খবর নিয়ে জান্‌ল যে, কুঞ্চিত কেশধারী সুদর্শন চঞ্চল অতি সাধারণ ঘরের ছেলে এবং সংসারে তার অভাব আছে।

কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি সে একদিন চঞ্চলের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল।

ঝিলিকের মামা তার বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছে—চঞ্চল কোথায় তাকে বসাবে, কি খেতে দেবে ঠাহর করতে না পেরে হক্‌-চকিয়ে যায়।

বৃন্দাবন মৃদু হেসে বল্লে, কিচ্ছু তোমার ব্যস্ত হতে হবে না ভায়া, ঝিলিকের বন্ধু তুমি···তুমিও আমার ভাগ্নে, বুঝলে ?

চঞ্চলও ইতিমধ্যে কানা-ঘুষা শুনতে পেয়েছিল যে, মাতুল বৃন্দাবন অভিভাবক হিসেবে ঝিলিকের বিরাট সম্পত্তির রাশ টেনে ধরবে। নেহাৎ বরাৎ খারাপ হলে ওখানকার অন্ন-জল বন্ধ হয়ে যেতেও পারে। সুতরাং মাতুলকে যে খুশী করা প্রয়োজন, সে কথা কদিন থেকেই সে ভাবছিল।

চঞ্চলের পক্ষে এ একেবারে মেঘ না চাইতেই জল। সুতরাং বৃন্দাবনের স্নেহসিক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা চঞ্চলের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নইলে আবু-হোসেনের বাদশাগিরি দু'দিনেই খতম হয়ে যেতে পারে।

পাঁচ মিনিট আলাপের পর বৃন্দাবন আর চঞ্চল স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে বুঝতে পারল যে, তারা রতনে-রতন চিনেছে! ভাবনার আর কোন কারণ নেই।

তখন বৃন্দাবন চঞ্চলের বাবার হুঁকোটা ধরিয়ে নিয়ে আমেজ ক'রে হুটো সুখটান দিয়ে বল্লে, তবে বলি শোনো বাবাজি, দুটি প্রাণের কথা তোমায় কই। বড় লোকের ছেলে, প্রচুর টাকা। এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হবে। হবে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। পাড়ার সবাই যদি লুটে-পুটে নেয়—আমরাই বা বাদ যাবো কেন?

সাহস পেয়ে চঞ্চল বলে, সে ত' সত্যি কথাই মামাবাবু।

হা-হা করে অট্টহাস্যে ভেঙে প'ড়ে বৃন্দাবন জবাব দিলে, মিছে কথা বৃন্দাবন কয় না, এইটুকু তুমি জেনে রাখো বাবাজি। দ্বিজু রায় কি বলে গেছেন জানো ত?

“হরির কৃপায় দশজনে খায়
আমরা কেন গো খাব না?”

তাই আমাদের দু'জনের খাবার ব্যবস্থা ভালো ক'রে করতে হবে। তবে এটা তুমি জেনো বাবাজি যে, আমার ভাগনের তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। সমুদ্রের জল—এক গণ্ডুষ গেলেই বা কি, থাক্‌লেই বা কি?

চঞ্চল এইবার একটু রসিকতা করবার চেষ্টা ক'রে বল্লে, আজ্ঞে হ্যাঁ, যাকে বলে বোঝার ওপর শাকের আঁটি!

অট্টহাস্যে নিজের সমর্থন জানিয়ে বৃন্দাবন পুনরায় ঘন-ঘন হুঁকো টেনে ধোঁয়ায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে।

চোখ-মুখে তার কৌতুক নেচে বেড়াতে লাগল। বৃন্দাবন পুনরায় সুরু করলে:

তোমার সঙ্গে 'প্যাক্ট' যখন হয়ে গেল···তখন আমার প্ল্যানটা শুনে রাখো বাবাজি। আমি যখন প্রস্তাব তুলবো তোমাকেই ত সমর্থন করতে হবে।

চঞ্চল শুধালে, প্ল্যানটা কি বলুন ত' মামাবাবু—? বৃন্দাবন গলা খাটো ক'রে বল্লে, সিনেমা কোম্পানী খুলতে হবে—হা-হা-হা—

চঞ্চল আশ্চর্য হয়ে বল্লে, সিনেমা কোম্পানী? সে ত' অনেক টাকার দরকার।

বৃন্দাবন জবাব দিলে, তা অনেক টাকা নিয়েই কাজ সুরু করতে হবে বৈ কি! এই যে প্রত্যহ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব রাখছে কে শুনি? শোনো বাবাজি, তুমি আর আপত্তি তুলো না। আগেকার দিনে বড় লোকের ছেলেরা হঠাৎ সম্পত্তি হাতে পেলে বাগান-বাড়ী-পর্ব সুরু করে দিত··· আর আজকালকার দিনে ফেঁদে বসে সিনেমার ব্যবসা। এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে শুনি? তুমি হবে ডিরেক্টর আর আমি হবো প্রোডাক্শন্ ম্যানেজার। তার পর যদি সুবিধে মত একটি হিরোয়িনের সঙ্গে বাবাজীর যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি, তবে আমাদের বাড়া ভাত খায় কে?

আপন রসিকতায় বৃন্দাবন আপনিই হাস্‌তে লাগলো। এর সঙ্গে লাগ-সই একটা ফোড়ন না দিলে ভালো দেখায় না বিবেচনায় চঞ্চল চুটকি দিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন মামাবাবু, "বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্।"

বৃন্দাবন চোখ বুজে কথাটা আস্বাদন ক'রে জবাব দিলে, নিশ্চয়! এই যে প্রত্যহ চপ-কাট্‌লেট আর চা উড়ছে···এতে কোন্ দেবতার নৈবিদ্যি সাজানো হচ্ছে শুনি? এ হ'ল আরো ভালো। দশটা

লোকের অন্ন হবে,—আমরাও কাজ গুছিয়ে নিতে পারবো। তুমি আর অমত কোরো না বাবাজি। আজ রাত্রেই আমি প্রস্তাব তুলবো। এসো, হাতে হাত দাও।

বৃন্দাবন আর চঞ্চলের অলিখিত প্যাক্টের স্বাক্ষর হয়ে গেল। চঞ্চল বল্লে, মামাবাবু, একটু চা খেয়ে যাবেন না?

বৃন্দাবন জবাব দিলে, আজ তামাক পর্যন্তই থাক ভায়া, পরে একদিন পাত পেতে বসে চেয়ে খেয়ে যাবো। দাঁড়াও, আগে তোমায় ডিরেক্টর ক'রে দিই।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, সিনেমা-ব্যবসার সূত্রপাত করতে হবে এবং তখুনি 'ঝিলিক্ চিত্র-প্রতিষ্ঠানে'র নামকরণ-উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল।

ঝিলিক্ বল্লে, শোনো মামা, ব্যবসা আমি ঠিক চালিয়ে যাবো, তবে নায়কের ভূমিকায় কিন্তু আমায় নামাতে হবে।

তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বৃন্দাবন বল্লে, সে কথা আর বলতে বাবাজি! তোমার জন্যে আমি সাগর-ছেঁচা-মাণিক নিয়ে এসে ছবির নায়িকা ক'রে দেবো। 'হিট্-পিক্চার' যদি না হয় তবে তুমি আমার নামে কুকুর পুষো বাবাজি!

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাইরের বৈঠকখানা-ঘরটিকে চেয়ার-টেবিল, সোফা, টাইপ-রাইটার, ফাইল, 'হোয়াট্-নট্' প্রভৃতিতে কণ্টকিত ক'রে তুলে 'ঝিলিক্ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের' অফিসে রূপান্তরিত করা হ'ল।

ঝিলিকের সঙ্গে পড়ত একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। তাকে কোম্পানীর টাইপিষ্টের পদে বাহাল করা হ'ল। পুরুষ ভূমিকাগুলির

জন্যে কোন ভাবনার প্রয়োজন নেই। পাড়ায় যে অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় ছিল তার বেকার সভ্যদল এসে অফিস্-গৃহ জাঁকিয়ে তুললো। শুধু প্রয়োজন তিলোত্তমা-সদৃশ একজন নায়িকার।

চঞ্চল প্রস্তাব উত্থাপন করল যে, খেঁদি-পেঁচীকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হবে না। শিক্ষিতা, উচ্চবংশ-সম্ভূতা, কৃষ্টিসম্পন্না আধুনিকাকে নায়িকারূপে বাছাই ক'রে নিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

পরের দিন ক'লকাতার বিভিন্ন দৈনিকে এই বিজ্ঞাপনটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ঃ

তারকা-তল্লাসে

'ঝিলিক চিত্র-প্রতিষ্ঠানে'র প্রাথমিক 'হিট্ পিক্চার' 'প্রথম দর্শনে প্রেম' ছবিটির জন্য সর্বসুলক্ষণযুক্তা তারকা আবশ্যক। উচ্চশিক্ষিতা, সদ্বংশজাতা, কৃষ্টিসম্পন্না, সঙ্গীত ও নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রীর প্রয়োজন। ফটোসহ আবেদন করিলে চলিবে না। স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে হইবে। চিত্রের নায়ক নিজে নায়িকা নির্বাচন করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ, ঝিলিক চিত্র-প্রতিষ্ঠান
১২।৩ এ, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা।

খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হবার পর থেকে ঝিলিকের বাড়ীতে কালো, মোটা, লম্বা, সরু, হাড়গিলে, অস্থিচর্মসার, দোহারা, দাঁত-উঁচু, থ্যাব্ড়ানাকী প্রভৃতি যেরকম নারীসমাগম হতে সরু হ'ল, তাতে ছিলিকের মা প্রমাদ গণলেন

এবং পাড়া-পড়শীর দল নিজেদের অবিবাহিত ছেলেদের সম্পর্কে ভয় পেয়ে পুলিশে খবর পাঠিয়ে দিলেন।

ঝিলিকের মা অন্তঃপুরে ছেলেকে ডেকে পাঠাতে সে বল্লে, মা, তুমি কিছু মাত্র ভয় পেয়ো না। বাবা তিসির ব্যবসা ক'রে বড়লোক হয়েছেন ; সত্যি কথা। কিন্তু এখন যুগ পাল্‌টে গেছে। তিসি নিয়ে কারবার করলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো চলে না। এই সিনেমার ব্যবসা ক'রে আমি তোমার পূজোর ঘর সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো। তুমি সোনার বেলপাতা দিয়ে মহাদেবকে পূজো কোরো।

ভাণ্ডারী-গৃহিণী ছেলের কথা শুনেই হোক্ অথবা সোনার বেলপাতা দিয়ে মহেশ্বরের পূজোর প্রলোভনেই হোক্...চুপ ক'রে রইলেন। ও দিকে বৃন্দাবনের উৎসাহের বিরাম নেই।

কি ভাবে মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে সেই পরিকল্পনা নিয়ে তার স্নান-খাওয়ার সময়ের অভাব ঘটতে লাগ্‌লো।

এই উৎসবের 'মেনু' রচনার ভার পড়েছে চঞ্চলের ওপর। সে তদনুসারে এক বিরাট তালিকা তৈরী ক'রে ফেলেছে, কাজও সুরু হয়ে গেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে আসছে সরপুরিয়া, বর্ধমান থেকে সীতাভোগ আর মিহিদানা, ঈশ্বরদীর ছানার জিলিপি, মোল্লার চকের দৈ, 'আবার-খাবো' সন্দেশ, সরেশ রাবড়ী—তা ছাড়া চপ, কাট্‌লেট, ডেভিল, পুডিং প্রভৃতির আয়োজনেও ত্রুটি নেই।

কিন্তু মুস্কিল বাঁধালো নায়িকা।

'প্রথম দর্শনে প্রেম' ছবির নায়িকা-নির্বাচনে সত্যি গোলমাল বেঁধেছে।

এ একটা বিরাট সমস্যা বলতে হবে।

কেন না—এক্ষেত্রে পরিচালক নায়িকা নির্বাচন করছেন না—মনোনয়নের দায়িত্ব নিয়েছে নায়ক নিজে।

অথচ মহরতের নির্দিষ্ট দিন ঘনিয়ে এলো। ষ্টুডিয়োতে টাকা জমা দেয়া হয়েছে, নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হয়ে এসেছে। বাইরের অধিকাংশ মিষ্টিও এসে পড়েছে। কালীঘাটে বিশেষ পূজোর ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলা হয়েছে, অথচ নায়কের প্রথম-দর্শনে-প্রেম ঘনীভূত হচ্ছে না।

চিত্র-জগতে এর চাইতে বড়ো ট্র্যাজেডী আর কি হতে পারে?

সেই দিন গভীর রাত্রে বৃন্দাবনের সঙ্গে চঞ্চলের কথা হচ্ছে।

তামাক টানতে টানতে উৎসাহের সুরে বৃন্দাবন চঞ্চলকে জিজ্ঞেস করলে, একটা ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করেছ ভায়া?

চঞ্চল চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞেস করলে, কি বলত মামাবাবু?

বৃন্দাবন চোখ টিপে বল্লে, মিঠাই-মণ্ডার চিন্তায় রাত দিন বিভোর হয়ে আছ, আরো সব মিষ্টি ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি দিও।

চঞ্চল পুনরায় নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে বৃন্দাবন বল্লে, কদিন থেকে লক্ষ্য করেছি আমাদের টাইপিষ্ট পাম্‌লির সাথে আমার ভাগনের গুজ-গুজ ফুস্‌-ফুস্‌ লেগেই আছে। চিঠি টাইপ করার কাজ বাবাজীর যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তুমি Out door

এর লোক কি না, তাই In door affair-এর দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ পাও নি!

চঞ্চল অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু আ মা দে র না য়ি কা সমস্যার সমাধান তা হলে কি করে হবে?

হো-হো করে হেসে উঠে বৃন্দাবন জবাব দিলে, সমস্যার সমাধান ত' ওরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। কোনো আপত্তি কোরো না বাবাজি, পাম্‌লীকেই আমরা নায়িকা নির্বাচন করবো।

—আপনি বলছেন কি মামাবাবু? চঞ্চলের মুখ থেকে একরাশ বিস্ময় ধোঁয়ার মত বেরিয়ে এলো। পাম্‌লী ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ও বাংলা বলবে কি করে?

বৃন্দাবন জবাব দিলে, যা বলবে তাতেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। 'প্রথম দর্শনে প্রেমের' নায়িকা হচ্ছে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে। ভাঙা বাংলার সঙ্গে ইংরেজী মিশিয়ে তৈরী করবে তার 'ডায়ালগ'; হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কি?

চঞ্চল ভয়ে ভয়ে বল্লে, কিন্তু ছবির তাতে একেবারে বারোটা বেজে যাবে!

বৃন্দাবন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত নিক্ষেপ ক'রে উত্তর দিলে, তা বাজুক···আমরা সেই ফাঁকে আমাদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারবো। বুঝতে পারলে না বাবাজি? প্রথম দর্শনে প্রেম! সেটাকে ত আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে।

চঞ্চল এইবার উৎসাহিত হয়ে বল্লে, না, তা ছাড়া আর কি করতে পারি মামাবাবু?

বৃন্দাবন এইবার খুশী হয়েছে বলে মনে হল। হুঁকোতে আর একটা সুখটান দিয়ে বল্লে, "যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?·· হরে মুরারে।"

মায়াপুরী ষ্টুডিয়োতে সন্ধ্যেবেলা "ঝিলিক চিত্র-প্রতিষ্ঠানে"র প্রাথমিক চিত্র-নৈবেদ্য "প্রথম দর্শনে প্রেম" চিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠান।

একটি ফ্লোরকে এজন্য আলোক-মালায় সজ্জিত করা হয়েছে। নানা বেশভূষা-পরিহিত হরেকরকম স্ত্রী-পুরুষ উৎসব-প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হচ্ছেন, আর বাইরের রাস্তায় মোটরের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনুষ্ঠান অন্তে একটা মোটরের শোভা-যাত্রাই হয়ত বের করা হবে।

গ্রামোফোন রেকর্ডে যত প্রেমের গান আছে তার থেকে বাছাই ক'রে একশ-এক "উচ্ছ্বসিত প্রেম-সঙ্গীত" চঞ্চল বাছাই ক'রে নিয়ে এসেছে। 'লাউড স্পীকারে' একটার পর একটা তাই বাজানো হচ্ছে। যারা শুনছে তারা মোহিত হয়ে প্রেমে পড়ার প্রেরণা

লাভ করছে···আর বেরসিক দল সিগারেট টেনে আর পান চিবিয়ে কোনো রকমে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে।

নিমন্ত্রিত মহিলাদল নিজেদের গহনা আর রসনার কাহিনীতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সেই পীঠস্থানে প্রবেশ করলো প্রডাক্‌সন্ ম্যানেজার বৃন্দাবন। ডান হাত তার মা-কালীর মন্দিরের সিঁদুর-সিক্ত বিল্বপত্র আর বাঁ হাতে প্রসাদী-প্যাড়া।

ক্যামেরার কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হল জবাফুলের মালা। পরিচালক তৎপর হয়ে উঠেছেন।

ক্যামেরাম্যান আলোক নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছেন। সকলের দৃষ্টি ক্যামেরার দিকে নিবদ্ধ···

কিন্তু হা-হতোস্মি···

নায়ক-নায়িকার দেখা নেই!

'প্রথম দর্শনে প্রেমে'র মধু-লগ্ন কি এইভাবে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে!

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃদু-গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো। পরিচালক চঞ্চল এসে প্রডাক্‌সন ম্যানেজার বৃন্দাবনকে শুক্‌নো মুখ নিয়ে শুধোলে, মামাবাবু তাহলে এখন উপায়?

বৃন্দাবন বললে, ভয় কি বাবাজি···এক্ষুণি ওরা এসে যাবে। বুঝতেই ত পারছ 'প্রথম দর্শনে প্রেম'! একটু বাড়াবাড়ি ত' হবেই। তুমি বরঞ্চ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে খাবারের প্লেট বিলিয়ে দাও, তা হলে সকলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

বৃন্দাবন মিছে কথা বলে নি।

খাবারের প্লেট বিলি হবার সঙ্গে সঙ্গে কুপিতা নাগিনীর মাথায় যেন মন্তর পড়া হল।

চাকুম-চুকুম শব্দে 'ফ্লোর' মুখরিত হয়ে উঠল।

এমন সময় এক ভগ্নদূত এসে বৃন্দাবনকে খবর দিলে, নায়ক-নায়িকা দার্জিলিং চলে যাচ্ছে।

পরিচালক খবর শুনে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল! বৃন্দাবন তাকে ধরে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিলে।

এমন সময় একখানা বাড়ীর গাড়ী দ্রুতগতিতে সেইখানে এসে হাজির হ'ল।

একসঙ্গে সবাই চীৎকার করে উঠল—এসেছে এসেছে···

বৃন্দাবন ছুটে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই তার থেকে বেরিয়ে এলেন ঝিলিক জননী!

তিনি হয় ত লুচি বেল্‌ছিলেন। হাতে পাথরের শক্ত আর মোটা বেলুনী।

খবর পেয়ে সেই অবস্থাতেই গাড়ী ক'রে চলে এসেছেন।···

বৃন্দাবনকে সামনে পেয়েই তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, তুই আমার সর্বনাশ করতেই এসে জুটেছিস্···তারপর সেই পাথরের বেলুনী তড়িৎগতিতে এসে পড়ল তার মাথার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন পপাত ধরণী-তলে!

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হ'ল।

চঞ্চল ঝিলিক-জননীর রণ-রঙ্গিণী মূর্তি দেখে আত্মরক্ষার জন্য একটি থামের আড়ালে লুকিয়ে কাঁপছিল আর দুর্গানাম জপ করছিল; এইবার আড় নয়নে বৃন্দাবনের অবস্থা দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বল্লে, হ্যাঁ একটা 'হিট্ পিক্‌চার' বটে!

ক্যামেরাম্যান বল্লে, নিশ্চয়! এক মিনিট! ব্যাপারটা ক্যামেরায় তাড়াতাড়ি তুলে নি!

অতিবড় দুঃখের মধ্যেও যে কি ভাবে অতি কৌতুকজনক এক-একটি কাণ্ড ঘটে থাকে, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুধু এই কথাই বলা চলে যে, বিধাতা বোধ করি দৈনন্দিন কাজে ঘর্মাক্ত হয়ে অবসরে চিত্ত-বিনোদনের জন্যে একটুখানি রসিকতা করবার চেষ্টা করছেন !

বাঞ্ছারামের সঙ্গে টে'পীর পরিচয় রাণাঘাট প্ল্যাটফর্মে।

ইতিপূর্বে বাঞ্ছারাম পাকিস্তান থেকে আগত বহু উদ্বাস্তুর মাল বয়ে দিয়েছে, রোগ-কাতর লোককে কাঁধে করে নিয়ে গেছে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে, দুর্গতদের মধ্যে পুরোণো কাপড় বিলি করেছে, রেশনের ব্যবস্থা করেছে আপ্রাণ পরিশ্রমে, কিন্তু এমন মন-উচাটন কখনো তার হয়নি।

ব্যাপারটাকে জটিল বলতে পারা যায়। অন্যান্য দিনের মতো বাঞ্ছারাম রাণাঘাট ষ্টেশনে সেবাকার্যে রত ছিল। সিরাজগঞ্জের ট্রেন এলে মেয়েদের একটা কামরা থেকে হাউ-মাউ কান্না শুনে বাঞ্ছারাম সেই দিকেই এগিয়ে গেল। আজকাল নানারকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এমনিই ত' পূর্ববঙ্গ থেকে সবাই সব খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আস্‌ছে, তার ওপর কতকগুলি দুষ্ট-প্রকৃতির লোক সুবিধে বুঝে অনেকের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় নিয়ে সরে পড়ছে। সেবাকার্য করতে এসে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে এমন উদাহরণও আশ্রয়-শিবিরে অপ্রতুল নয়। কাজেই মুহূর্তমধ্যে কর্মতৎপর বাঞ্ছারামের সজাগ কর্ণদ্বয় চঞ্চল হয়ে উঠল।

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—একটি পল্লীগ্রামের বয়স্থা মেয়ে চীৎকার করে কাঁদছে আর চোখের জল ফেল্‌ছে ?

বাঞ্ছারামের স্বভাবসিদ্ধ পরোপকার-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করলে, কি গো বাছা, এমন করে হাপুস নয়নে কাঁদছ কেন ? কী হয়েছে তোমার ?

প্রশ্ন শুনে টেঁপীর কান্না ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হল। তারপর হঠাৎ কলের জলের মত তার অশ্রু-উৎস আবার খুলে গেল। ভেউ-

ভেউ করে সে বললে, কাঁদুম না? এতেও যদি কাঁদন না আসে ত' চোখের জল ফেলুম কি চিতার তলায় গ্যালে?

বাঞ্ছারাম বল্লে, আহা বাপু, কি হয়েছে তাই বল না।

টেঁপী জবাব দিলে, নতুন কইর‍্যা কওনের আর কি আছে? সর্বস্ব খুইয়্যা আইলাম পাকিস্তান থনে। আইসব্যার সময় আমার গয়নাগুলা অবধি কাইড়্যা রাইখ্‌ল্যো।

বাঞ্ছারাম উত্তেজিত হয়ে ওঠে: কে কেড়ে রেখেছে তোমার গয়না বল দেখি? জানো, নেহেরু-লিয়াকৎ প্যাক্ট হয়ে গেছে? ও সব জুলুমবাজি এখন আর চলবে না।

বাঁ-হাতের চেটোয় চোখের জল চট্ করে মুছে ফেলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল টেঁপী—হুঁ, অ্যাক্টো হইচে। তোমরা এহানে বইস্যা অ্যাক্টো কইরব্যা আর ওহানে আমাগো পরাণ লইয়া টানাটানি!

—আহা বাছা, তোমার গয়নাগুলি কে কেড়ে নিলে সেই কথা আগে বলো। বাঞ্ছারামের অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

টেঁপী মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে জবাব দিলে, কে আবার নিবো? —ওই ছায়েদ আলী। আমারে কয় কিনা নিকা বয় আমার লগে। আমি হিন্দু ঘরের মাইয়্যা, নিকা বইসতে যামু তোর লগে? মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন! কইলাম, গয়না নিত্যাছিস, নে; কিন্তু আমারে পাবি না। চইল্লাম আমি হিন্দুস্থানে। তা মুখপোড়া কয় কি—বর জোটাইতে চল্লি নাকি টেঁপী? আমি কইলাম, নয়ত কি? সেহানে কি মনের মানুষের অভাব নাকি?

অপাঙ্গে সে বাঞ্ছারামের দিকে তাকায়। কে বলবে খানিকটা আগে টেঁপী ডাক ছেড়ে মরা-কান্না কাঁদছিল।

বাঞ্ছারাম তাকিয়ে দেখলে…

টেঁপীর স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল দেহ…হিন্দুস্থানের অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তা হল্‌দে হয়ে ওঠেনি…কিম্বা বেরিবেরি সেখানে আশ্রয় নেয়নি। পরিশ্রম করলে শরীর যে সুন্দর হয়, বাঞ্ছারামের চোখের সামনে জ্বলন্ত উদাহরণের মতো টেঁপী সে কথা নিজের অজান্তে জানিয়ে দিল।

কিন্তু কঠোর বৈরাগী বাঞ্ছারামের সে কথা ভাববার অবসর কোথায়? বাপের অমতে সে সেবাকার্য করতে রাণাঘাট এসেছে। …স্নান নেই, আহার নেই, সময় মতো নিদ্রাও বোধ করি নেই। কত ছেলে-মেয়েকে সে নিরাপদ স্থানে পোঁছে দিয়েছে, কলেরা-রোগীর মল মুক্ত করেছে, রাত জেগে বসন্ত রোগীর শিয়রে বসে বাতাস করে মাছি-মশা তাড়িয়েছে…এই ত তার কাজ।

যুদ্ধের চাইতেও কঠিন আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ তার হাতে। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন প্রেয়সীর সুন্দর মুখখানি সেই আগুনের মধ্যে দেখবার অবকাশ জোটে কি?

বাঞ্ছারাম ইচ্ছে করেই টেঁপীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

টেঁপী কিন্তু দু'পা এগিয়ে এলো। বল্লে, ও ভালো মাইনষের ব্যাটা, আমারে একটা সুবিধামত জায়গায় থাকনের ব্যবস্থা কইর‍্যা ছ্যাও। আমি গতর খাটাইয়্যা কাজ করুম। ঘরের লগে জমি যদি পাই তবে লাউডা-কলাডা ফলাইয়া তুলুম। কাজ করনে ভয় পাই না আমি।

বাঙ্গারাম জবাব দিলে, আচ্ছা, এখন তোমায় আমি কুপার্স ক্যাম্পে পৌঁছে দিচ্ছি। কাল এসে দেখবো—তোমায় অন্য কোনো গেরস্ত-বাড়ীতে রাখতে পারি কি না।

টেঁপী এর পর আর বিশেষ আপত্তি করল না। শুধু একবার শুধোলো, তুমি আমার খোঁজ-খবর লইবা ত' ঠিক? যে মানুষের ম্যালা দেইখ্‌তাছি, তাতে গরু খোঁজা করলেও চেনা মানুষ খুইজ্যা পাওন দায়।

বাঙ্গারামের কেন যেন মনে হল—ভবের হাটে মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যি দায়! নইলে সেবাকার্য করতে এসে এই অশিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী সরলা মেয়েটি তার মনকে অকারণে টানছে কেন? কলেজে দুর্বাসা বলে ওর একটা বাড়তি নাম আছে। কেননা, মেয়েদের সঙ্গে ও সহসা মেশে না; আর প্রয়োজনের খাতিরে কথা বলতে হলেও অকারণে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও সুরেলা হয়ে ওঠে না। ছেলেরা বলে, তুই কি রকম কাটখোট্টা রে, কার সঙ্গে কি রকম ক'রে কথা বল্‌তে হয় তুই জানিস্‌নে?

এই দিন সাতেক আগেও সে সেবাকার্যে যাচ্ছে শুনে ক্লাসের তনিমা সান্যাল জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, বাঙ্গারামবাবু, মেয়েরা ওখানে গিয়ে কি সেবার ভার নিতে পারে না?

বাঙ্গারাম একবার ওর বেশ-ভূষার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জবাব দিয়েছিল, পারে। কিন্তু সাড়ি আর লিপষ্টিকের বাহার নিয়ে সিনেমাতেই মানায় ভালো।

তনিমার 'অ্যাড্‌মায়ারারের' দল তখুনি ঘুঁষি উঁচিয়ে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এসেছিল

কিন্তু তনিমাই নাকি শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটতে দেয়নি।

ছেলের দল তাতে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ভাগ্যিস, মনের কথা মুখে লেখা থাকে না!

সেই ছেলের দল আজ যদি জানতে পারে যে, একটি চাষার মেয়ে বাঞ্ছারামের মনকে টেনেছে, তা হলে কলেজ-ম্যাগাজিনে বেনামীতে কবিতা আর কার্টুন যে বেরুবে না সেই কথাই বা কে বলতে পারে?

তারপর সারাদিনের কাজের ঘূর্ণি হাওয়ায় বাঞ্ছারাম মেয়েটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল।

সকাল বেলা লাইন দেয়া লোকদের রেশন-কার্ড ব্যবস্থা করবার সময় হঠাৎ মনে হল কুপার্স ক্যাম্পে গিয়ে টেঁপীর একবার খবর নেয়া প্রয়োজন।

নিজের দায়িত্বটা অন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে বুঝিয়ে দিয়ে বাঞ্ছারাম ষ্টেশন ছেড়ে রাস্তার দিকে রওনা হল। সেই সময় "মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির" একটি ট্রাক শিবিরের দিকে যাচ্ছিল। ওদের ড্রাইভার আর ভলান্টিয়ার বাঞ্ছারামের পরিচিত। তারা ওকে ডেকে ট্রাকের ওপর তুলে নিলে।

ক্যাম্পে পৌঁছে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে বাঞ্ছারাম আর টেঁপীকে খুঁজে পায় না। মেয়েটা রাত্তিরের মধ্যে একেবারে কর্পূরের মতো উপে গেল নাকি!

অনেক ছুটোছুটির পর দেখা গেল—ক্যাম্প ছেড়ে একটা গাছতলায় টেঁপী পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। বাঞ্ছারাম ওকে গতকাল

রেশন-কুপন জোগাড় করে দিয়ে গিয়েছিল। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে টেঁপী, তুই রান্না করবি নে? চাল-ডাল কোথায়?

টেঁপী একবার মুখ তুলে ওকে দেখে বল্লে, চাইল-ডাইল রাস্তায় ছড়াইয়া ফেইল্যা দিছি। বাঞ্ছারাম ভাবলে, আচ্ছা পাগলি মেয়ে ত! তবু শুধোলে, চাল ডাল ফেলে দিলি, খাবি কি? টেঁপী বল্লে, খামু আমি আখার ছাই!

এত দুঃখেও বাঞ্ছারাম হেসে ফেলে।

বল্লে, কিন্তু উনুনের ছাই খেলে ত আর পেট ভরবে না! টেঁপীর চোখে আবার জল দেখা গেল। মাথা নীচু করে বল্লে, পরাণ আমার বাইর হইয়্যা যাউক। এমন পরাণ থাইক্‌লেই বা কি, গ্যালেই বা কি!

কি তোর মনের ব্যথা আমায় খুলে বল ত' টেঁপী। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যদি কিছু করতে পারি। ধীরে ধীরে বাঞ্জারাম বল্লে। ঠিক যেন অনেকটা বাসর ঘরের প্রেম-গুঞ্জনের মতো।

টেঁপী ফোঁস করে উঠে বল্লে, বাইরের গোটা কয়েক পেটমোটা মুখপোড়া—তোমাগো হাওয়া গাড়ী চইর‍্যা আইছিল। মিঠা মিঠা কথা কয়। গা গয়নায় ভইর‍্যা দিবো, কোন্ বাগাদ-বাড়ীতে নিয়া রাইখ্‌বো—পায়ের উপর পা থুইয়া খামু—দাসী গা টিপ্যা দিবো···আরো কত কথা···মুয়ে আগুন মুখ-পোড়াগো। আমাগো এই দুঃসময়, আর ওরা আইসে কাটাঘায়ে লবণের ছিটা দিবার লাইগ্যা।

কথাটা বাঙ্গারাম একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। একদল বজ্জাত লোক এই উদ্দেশ্যে গভীর রাতে শিবিরের আশে-পাশে ঘোরে—একথা আরো দু একজন স্বেচ্ছাসেবক তাকে কয়েকদিন আগে বলছিল…কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু আজ টেঁপীর মুখের কথা শুনে আর তার চোখে জল দেখে সে বুঝ্‌লে যে ব্যাপারটা মিথ্যে নয়।

তা হলে ত টেঁপীকে কোথায়ও সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টেঁপী ধমক দিয়ে ওঠে, কি গো ভালো মাইন্‌ষের পোলা, মুখে বোবা-কাঠি ছোয়াইলা নাকি? ভাইবলা, পরের ম্যায়ার ঝক্কি খামাখা কে ঘাড়ে নেয়? ভার যদি না নিবা ত খাজুইর‍্যা আলাপ কইরবার আইছিলা ক্যান্‌?

সত্যি কথাই ত!

ভারই যদি না নেবে তবে বাঙ্গারাম মিছিমিছি টেঁপীর খোঁজ নিতে এসেছ কেন? শুধু স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব থেকে কি?

না—না, এই সকল গ্রাম্য মেয়েটাকে সহরের কামনার পঙ্কিল স্রোতে ভেসে যেতে দেয়া হবে না। যে ক'রেই হোক বাঙ্গারাম তাকে বাঁচাবে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বাঙ্গারাম বল্লে, দেখ্‌ টেঁপী, এই রাণাঘাটেই আমার এক দিদি আছে। চল, তোকে সেইখানেই রেখে আসি।

টেঁপী এক গাল হেসে ফেলে জবাব দিলে, তোমার দিদি? তাইলে ত' ভালই হয়। অ্যাখুনি আমারে নিয়া চল সেহানে। আমি দিদির পা জড়াইয়া ধইর‍্যা থাকুম।

বাঞ্ছারাম তখন বল্লে, তা হলে ত' ক্যাম্পের কর্তার অনুমতি নিতে হবে।

আঁচলে গাছ-কোমর বেঁধে টেঁপী হুংকার দিয়ে উঠ্‌ল, কার আবার মত ন্যাওন লাইগ্‌বো শুনি? ভাত-কাপড়ের কেউ না, নাক কাটনের গোসাঁই। হুঁ···চল-চল—

কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে তড় বড় করে টেঁপী উঠে দাঁড়ালো।

দিদি মুখে কিছু বল্লে না বটে, আইবুড়ো ভাইয়ের সঙ্গে এক সোমত্ত মেয়ে দেখে খুসী হতে পারল না।

বাঞ্ছারাম বল্লে, আহা, গেরস্ত ঘরের মেয়ে—বড় বিপদে পড়েছে। দিন কয়েক তোমার কাছে থাক—তারপর আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেবো। এর পর থেকে বাঞ্ছারাম তুবেলা এসে টেঁপীর খোঁজ নিয়ে যায় এটাও দিদি বিশেষ সুনজরে দেখেনি।

এই ভাইকে বিয়ে দেবার জন্যে আত্মীয়-স্বজন কত ঝুলোঝুলি, বন্ধু-বান্ধবদের কত বোঝানোর পালা। কিন্তু কেউ বাঞ্ছারামকে রাজি করাতে পারে নি।

সে যখন সবাইকার কথা অগ্রাহ্য করে সেবাকার্যে মেতে উঠ্‌লো তখন ভাইবোনের দল মনে করল, বাঞ্ছারাম বুঝি সত্যিই সন্ন্যাসী হবার জন্যে মনস্থ করেছে।

কিন্তু এখন একটি চাষার মেয়ের জন্য অহেতুক দরদ দেখে দিদির বাড়ীর সবাই নাসিকা-কুঞ্চন করতে সুরু করল।

সেদিন বাঞ্ছারামের দিদির বাড়ীর ঝি পালিয়ে গেল। বাড়ীতে কচি ছেলে, কাঁথা কাচ্‌বার কেউ নাই। দিদি ডেকে বল্লে টেঁপী

এই কাঁথাগুলিতে সাবান দিয়ে একেবারে স্নান করে এসো। টেঁপী এখানে এসে খুসী মনেই ছিল। সে গুণ-গুণ করে কেত্তন গাইতে গাইতে কাঁথায় সাবান মাখাতে বসল।

এমন সময় বাঞ্ছারাম এসে উপস্থিত। টেঁপীকে ময়লা কাঁথা কাচতে দেখে সে মনে মনে ভারী চটে গেল। তারপর দিদিকে ডেকে বল্লে, দিদি, তুমি টেঁপীকে দিয়ে এই সব নোংরা কাজ করাচ্ছ কেন ?

দিদি একটু অবাক হয়ে শুধোলে, কেন রে, তাতে কি হয়েছে ? গেরস্ত ঘরের মেয়ে···আমার এখানে আছে। কচি ছেলের জন্যে একটু কাজ করলে ত আর হাত ক্ষয়ে যাবে না !

বাঞ্ছারাম খানিকটা গুম্ হয়ে রইল। তারপর ফস্ করে বলে ফেল্লে, ও যে তোমার ভাই-বৌ হবে। ওকে একটু যত্ন-আত্তি না করলে চল্‌বে কেন ?

ওর দিদি নিজের মৃত্যুর কথা শুন্‌লেও বুঝি এমন করে আঁৎকে উঠ্‌ত না ! বল্লে, তুই বলিস্ কিরে বাঞ্ছা, শেষকালে চাষার মেয়েটাকে বিয়ে করবি ? জাত-কুলের কিছু ঠিক আছে ওর ভেবেছিস ? জ্যাঠামশাই শুন্‌লে কি বল্‌বেন ?

বাঞ্ছারামেরও মেজাজের ঠিক ছিল না। সে-ও গরম গরম জবাব দিলে, কেন ? টেঁপী এমন কি খারাপ মেয়ে শুনি ? ও পাউডার মাখে না, লিপষ্টিক্ ঘষে না, আয়নায় সাতবার করে মুখ দেখে না, ব্লাউজ পরে না, তাই সে খারাপ হয়ে গেল ? ওর স্বাস্থ্যটা দেখেছিস ? তোদের চারজনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। বদহজম আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভোগে না ! আর আজকের দিনে

আমি কোন জাত মানিনে। আমাদের কাছে সব মানুষই সমান—। জানিস্ ত কবি চণ্ডীদাস বলে গেছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

দিদি এই বিরাট বক্তৃতা শুনে আর কোন জবাব দিলে না, শুধু টেঁপীর হাত থেকে কাঁথা আর সাবান কেড়ে নিয়ে ওকে ওপরে পাঠিয়ে দিলে।

কিন্তু সেই দিন থেকে ও বাড়ীতে টেঁপীর নতুন নামকরণ হল—'রামী', আর বাঞ্ছারামের নাম হল 'চণ্ডীদাস'।

বাঞ্ছারাম বাড়ীতে এলেই মেয়েরা গিয়ে টেঁপীকে ঘিরে ধরে বল্‌ত, ভাই রামী, তোর চণ্ডীঠাকুর এসেছে—এই সময়ে একটি কেত্তন শুনিয়ে দে না ভাই—

টেঁপীর কিন্তু এসব রসিকতা ভালই লাগত, সে শুধু টিপে-টিপে হাস্‌ত—একটুও রাগ করত না।

এদিকে সে বাঞ্ছারামকে ধরে বস্‌ল, এখানে থাকন আর ভাল দেখায় না, তুমি একটি ঘর ঠিক কইর‍্যা আমায় সেইখানে নিয়া যাও। আমি একদিনে গেরস্থালি গুছাইয়্যা নিমু।

বাঞ্ছারাম খুসী হয়ে জবাব দিলে, সেই ভালো, আমি কল্‌কাতায় ঘর ঠিক করে তোমায় সেইখানে নিয়ে যাবো। তার আগে দিদির এখানেই বিয়েটা সেরে নিতে হবে। নইলে লোকে বল্‌বে কি ?

দিদি শুনে বল্লে, মুখে আগুন। আমি বিয়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারব না। আমার বাড়ীতে এসব কেলেঙ্কারী হলে জ্যাঠামশাই জীবনে আমার আর মুখ দর্শন করবেন না !

বাঞ্ছারামের ভগ্নীপতি রসিকতা করে বল্লে, আহা! তোমায় বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে কেন? আমার রসিক শ্যালকটিকে বলো,—সোজা শ্রীনবদ্বীপধামে চলে যেতে, সেখানে কণ্ঠিবদল করলে নবযুগের চণ্ডীদাস আর রামীর নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যাবে। চাই কি একটা যুগল-মিলনের ছবি পর্যন্ত বেরুতে পারে।

বাঞ্ছারামের দিদি মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বল্লে, তুমি আর জ্বালিওনা বাপু! বাসা করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে—তা নিয়ে যাক্ না; মেয়েটা গেলে আমি গঙ্গা-স্নান করে বাঁচি!

ভগ্নীপতি মশাই কিন্তু থাম্‌লেন না, বরং আরও উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, তুমি চট্‌ছ বটে গিন্নি, কিন্তু কল্‌কাতার কবিরা খবর পেলে এই শুভানুষ্ঠানের দীর্ঘ-প্রশস্তি রচনা করবেন। চাই কি, কোনো কোনো কাগজের একটি বিশেষ সংখ্যাও বেরিয়ে যেতে পারে।

বাঞ্ছারামের দিদি এই কথাগুলির প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে চাইল না, চোখ-মুখ লাল করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছনে বাঞ্ছারামের ভগ্নীপতির হেঁড়ে গলার কেত্তন শোনা গেল—

"শুন রজকিনী রামী—
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া শরণ লইনু আমি।"

তার পর সেকি হো-হো হাসি!

বাড়ীর গৃহিণীর কানে সে হাসি যেন বিষ ঢেলে দিল! নিজের ভাই—কইতেও পারে না, সইতেও পারে না! এ যেন শাঁখের

করাত—যেতে কাটে, আস্‌তে কাটে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বাঞ্ছারাম এলো টেঁপীর খবর নিতে।

ভগ্নীপতি চোখ টিপে বল্লে, ভায়ার উদ্বাস্তু-শিবির কি আজকাল আমার ঘরে এসে পৌঁচেছে? আগে যে টিকিটি দেখবার যো ছিল না! এখন দু'বেলা দিদির খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে! আহা! এমন ভাই থাকলে বনে গিয়েও সুখ!

বাঞ্ছারামের মন-মেজাজ ভাল ছিল না। কেননা, সে এখনো কল্‌কাতায় একটি ঘর সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই বল্লে, ঘর ভাড়া পাচ্ছি না বলেই তোমাদের এত কথা শুন্‌তে হচ্ছে জামাইবাবু। কোন মতে একটি জোগাড় করতে পারলে আমরা তোমাদের কথা শুন্‌তে আস্‌ব না।

ভগ্নীপতি বালিশ বাজিয়ে বল্লে, তা' আস্‌বে কেন? মধুর ভাণ্ড সরে গেলে কি মৌমাছি আর ফিরে আসে? তুমিও যে সেই দলের সে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। তা ভায়া, আজকাল সেবাকার্য ছেড়ে কি কবিতা রচনা সুরু করেছ? আমরা মানে— এই পাপীর দল কি দু' একটা পয়ার শুন্‌তে পাইনে?

বাঞ্ছারাম কথার কোন জবাব না দিয়ে তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। সেখানে নীচের অন্ধকার কোনটিতে টেঁপী তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কোন রকম ভূমিকা না ক'রেই টেঁপী তাকে আক্রমণ করল, কুটুম-বাড়ী আর কয় দিন থাকুম কও দেহি তুমি? একখান ঘর মিল্‌লো না কৈলকত্তা সহরে, এইকথা বুঝাইবার চাও আমারে? যদি এহান থনে আমারে লইয়া না যাও ত আমি গলায় দড়ি দিমু—

টেঁপীর ছু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। বাঞ্ছারাম অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখে মনে মনে তারিফ্ করে বল্লে, Splendid! তার এক শিল্পী বন্ধু যদি এই দৃশ্য দেখত ত ব্রাশের টানে চমৎকার ছবি এঁকে নিতে পারত। মোনালিসার হাসি আর টেঁপীর চোখের জল একই পর্যায়ের ক্ল্যাসিক্ হয়ে থাক্‌ত! আগে ঘরটা ভাড়া করে নিক। তারপর নিজের কোন সাধই অপূর্ণ রাখবে না!

বাঞ্ছারামকে তবু চুপ করে থাক্‌তে দেখে টেঁপী যেন একেবারে জ্বলে উঠল। বল্লে, ব্যাটা-ছাওয়াল না তুমি? নিজের পরিবারের ঠাঁই কইর‍্যা দিবার পার না, রাজ্যি শুদ্ধু মানুষের উপকার কইর‍্যা বাড়াও? কেমন মানুষ তুমি? আইজই তুমি আমারে এহান থনে লইয়া যাও—

বাঞ্ছারাম তাকে বুঝিয়ে বল্লে, তুমি রাগ কোরো না টেঁপী, আসছে কাল আমি বাসা ঠিক করে ঠিক তোমায় নিয়ে যাবো। এতে আর নড়চড় হবে না।

টেঁপী বল্লে, আমার গা ছুইয়্যা কও—না অইলে তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

বাঞ্ছারামকে প্রতিজ্ঞা করতে হল।

ওপরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ী শুদ্ধু লোক চণ্ডীদাস আর রামীর প্রেমালাপ শুনছিল, বাড়ীর কর্তা আবেগে গান গেয়ে উঠলো—

"তোমারি চরণে
আমারি পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—"

বাঞ্ছারাম ওপরের দিকে তাকিয়ে চোখের একমুঠি জলন্ত আগুন সকলের মুখে ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত পদে চলে গেল!

বাড়ীতে বাঞ্ছারামের দিদির ছিল এক দল ননদ। তাদের বেরসিক বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। তারা সবাই মিলে সকাল থেকে টেঁপীকে নিয়ে মেতে উঠল।

নতুন শ্বশুর-ঘর করতে যাচ্ছে—কনেকে মনের মত সাজিয়ে দিতে হবে ত!

এলো পাউডার, স্নো, লিপষ্টিক্, কাজল, বেলফুলের গোড়ে—আরো কত কি—

ওদিকে স্বপ্ন দেখছে বাঞ্ছারাম—

একটি ঘরের খবর পাওয়া গেছে শিয়ালদ' অঞ্চলে।

টেঁপী আস্‌ছে ওর ঘরণী হতে।

ও যে লজ্জা না করে তাকে ধমক দিয়ে ঘরের জন্যে তাগিদ দেয় তাতে বাঞ্ছারাম ওর নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার পরিচয় পায়।

এরাই ত' সত্যিকারের বীরাঙ্গণা। ভবিষ্যতে এই টেঁপীর দলই দেশে বীর-প্রসবিনী হবে।

বাঞ্ছারামের আদর্শ যেন তার জীবনে মূর্ত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করতে আস্‌ছে।

ননদের দল কিছুতেই ছাড়েনি···বৌদির একটি পুরোনো বেনারসী শাড়ী যোগাড় করে কনেকে সত্যি মনোমত করে সাজিয়েছে। কপালে চন্দন-তিলক জ্বল-জ্বল করছে।

পাড়া থেকে অনেকগুলি শাঁখও চেয়ে নিয়ে এসেছে। বাঞ্ছারামের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় মঙ্গল-ধ্বনি তুল্‌তে হবে।

সবই তৈরী…শুধু পাত্রেরই দেখা নাই…

এত দেরী কেন করছে বাঞ্ছারাম? ননদের দল একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

এমন সময় গলির মোড়ে হন্তদন্ত হয়ে বরকে আস্‌তে দেখা গেল।

সবগুলি শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠে গোটা পাড়াকে সচকিত করে তুল্‌ল।

বাঞ্ছারাম ভেতরে ঢুকে টেঁপীর কনে-সাজ দেখে অবাক্ হয়ে বল্লে, এ কি কাণ্ড?

ঘাড় হেঁট করে সলজ্জ ভঙ্গীতে টেঁপী জবাব দিল, দিদিমণিরা সব আমারে বিয়ার কনে সাজাইয়া দিল …আমি কি আর না কইরবার পারি?

টেঁপী টিপি-টিপি হাসতে থাকে।

কিন্তু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল বাঞ্ছারাম।
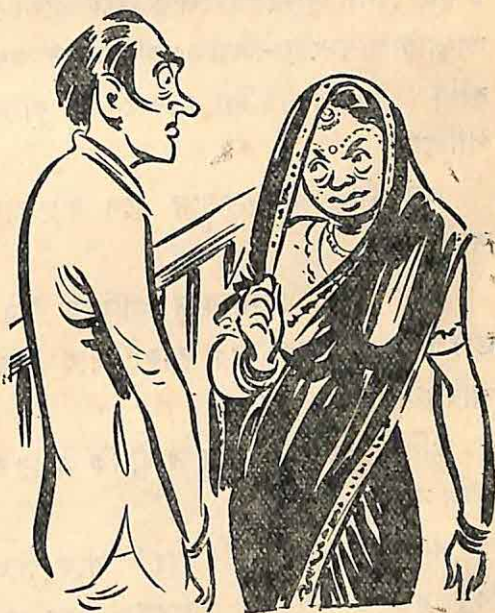
বল্লে, হুঁ! কনে সেজে ত' বসে আছ, ওদিকে হাতে-পাওয়া ঘর হাত-ছাড়া হয়ে গেল!

টেঁপীর মুখখানা দেখে মনে হ'ল—সে যেন অথৈ জলে তলিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে শুধোলে 'ক্যান্—কি অইল আবার?'

বাঞ্ছারাম হাত-মুখ নেড়ে জবাব দিলে, অনেক কষ্টে একখানি ঘর জোগাড় করেছিলাম। আগে মুসলমান ভাড়াটে ছিল। কিছু টাকা আগাম-দক্ষিণাও জমা দিয়েছি। সকালে গিয়ে খাট পেতেছি। দু'পুর বেলা পুলিশের লোক নিয়ে এলো সেই আগেকার মুসলমান ভাড়াটে। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির সর্ত অনুসারে ঘর ছেড়ে দিতে হল! আমরা হচ্ছি সমাজসেবী, চুক্তিভঙ্গ ত' আর করতে পারিনে!

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলে বাঞ্ছারাম কপালের ঘাম মুছতে লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেল কনে লাফিয়ে উঠে ফটকের দিকে ছুটছে··· তারপর একেবারে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে ছুটতে আরম্ভ করল।

রসিক ভগ্নীপতি বল্লে, রামী কি এবার বাশুলি মন্দিরের উদ্দেশ্যে ছুটল নাকি?

ননদের মুখ থেকে শাঁখগুলি পড়ে গেল! বাঞ্ছারাম প্রথমটা কিছু বুঝ্তে পারেনি। তারপর যখন দেখ্ল, টেঁপী সত্যি পথ দিয়ে পাগলের মতো ছুটছে—তখন সেও পেছন পেছন ধাওয়া করল।

ভগ্নীপতি পেছনে হাততালি দিয়ে বল্লে, এইবার চণ্ডী ঠাকুর আর রামীর পালাটা জম্‌বে ভাল—। হায় হায় এমন সময় খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টারও নেই।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে দু'জনে ষ্টেশনে এসে হাজির।

বাঞ্ছারাম শুধোলে, এ কি টেঁপী, পাগলের মতো তুমি চল্লে কোথায় ?

টেঁপীর চোখে জল! জবাব দিলে, দিদিমণিগো বড়-গলা কইর‍্যা কইচি আইজ আমি রওনা দিমু। তা তুমি ভালো মাইন্‌ষের পোলা যখন ঘরই পাও না—তখন আমি চইল্লাম।

অবাক হয়ে বাঞ্ছারাম জিজ্ঞেস করে, কোথায় তুমি চল্লে ?

টেঁপী কয়, পাকিস্তানে। সেখানে মুখপোড়া ছায়েদ আলী আমার গয়নার বাক্স লইয়্যা আমার পথ চাইয়্যা বইস্যা আছে।—

বাঞ্ছারাম চীৎকার করে ওঠে, সে কি! তুমি মুসলমানের কাছে ফিরে যাবে ?

টেঁপী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, ক্যান যামু না শুনি ? তুমি ভালো মাইন্‌ষের পোলা···একখান্ ঘর জোগাড় কইরব্যার মুরদ তোমার নাই। অ্যাক বেলা ভাত দিবার সামর্থ নাই তোমার। কিসের লাইগ্যা তোমার ঘর করুম ? ওহানে ছায়েদের তিরিশ বিঘা ধানি জমি, গাই-বলদ, খ্যাতের কলুই, পুষ্কন্নির মাছ···গোলাভরা ধান। না হয় তার আর তিনডা বিবিই আছে। সে আমার লাইগ্যা পাগল! আমার গয়না যে কইর‍্যা রাখ্‌ছে আমি তার কাছেই যামু···

পাকিস্তানগামী একটি ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। টেঁপী উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে একখানা কামরায় গিয়ে উঠল।

পাকিস্তানের পঞ্চশরের নাম কি বাঞ্ছারামের জানা নেই। নইলে সে তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসত।

কিন্তু কিছুই করা হল না।

কাজেই ফ্যাল-ফ্যাল করে চলন্ত ট্রেণের দিকে সমাজ-হিতৈষী বাঞ্ছারাম অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল!

রামধনুকের সাতটা রঙ মেশানো একটা মধুর-স্বপ্ন শৈলীর মনে-প্রাণে বাসা বেঁধেছিল যে, বাসরঘরে তার বর কী দিয়ে প্রথম কথা সুরু করে !

কিন্তু শৈলীকে সকল রকমে হতাশ ক'রে দিয়ে ভূপেশ যে কথার অবতারণা করল, নতুন কনে তার জন্যে আদপেই প্রস্তুত ছিল না।

আর সত্যি কথাই ত !

একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়, চাঁদের আলো, পাখীর গান, নদীর তান নয়, এমন কি সুন্দর একটি ফুলের নাম পর্যন্ত নয়…

একেবারে ছন্দ-পতনের মতো ভূপেশ বেমক্কাভাবে জিজ্ঞেস ক'রে বসল : পিঁপড়ের পেট টিপে সংসার চালাতে পারবে ? বাজার বড়ো খারাপ। যে কোনো দিন চাকরি চলে যেতে পারে…কাজেই তোমায় আগে থেকেই হুঁসিয়ার ক'রে দিচ্ছি।

শৈলী একেবারে থ মেরে গেল !

তবু মনে আশা…প্রথম কবিতা লিখ্তে গেলে ছন্দ-পতন হওয়া স্বাভাবিক। নবীন-কবি নিজের ভুল বুঝতে পেরে যদি কোনো রকমে ছন্দ আর মিলটা ঠিক ক'রে নেয়।

কিন্তু বৃথা আশা !

ভূপেশ আবার মন্তব্য প্রকাশ করল, সারাদিন উপোস করেছিলে, তোমার শরীর বোধ করি খুবই ক্লান্ত। মিছিমিছি বাজে কথা ব'লে তোমায় জাগিয়ে রাখবো না। আজ ঘুমিয়ে পড়ো।

যারা আড়ি পাততে এসেছিল তারা সবাই এই "অমৃত সমান মহাভারতের কথা" শুনে যে যার মতো সরে পড়ল।

শৈলীর দেহে-মনে সুগন্ধ…কপালে চন্দনের মধুর প্রলেপ। মনে হ'ল সেই চন্দন-লেখাগুলি বিছে হ'য়ে যেন তার সারা দেহে কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে !

গলায় যে সাদা রজনীগন্ধার মালাটা দুল্‌ছিল রাগ ক'রে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে সেটা গেল ছিঁড়ে। শৈলীর বুকে তখন যেন সাতটা ঢেঁকীর পাড় সুরু হয়েছে।

কিন্তু কাল সকালে সইয়ের দল যখন তাকে ঘিরে জিজ্ঞেস্ করবে

—কি প্রেমালাপ প্রথম রজনীতে হ'ল—ও তো কোনো জবাবই দিতে পারবে না!

গীতা, শ্যামলী, ছায়া, কমলা, ইন্দু···ওদের কাছ থেকে বিয়ের কনের প্রথম রাত্রের যে ইতিহাস সে সংগ্রহ করেছিল তাতে বিনা খরচায় বেমালুম একটি তাজমহল গড়ে আপনার মনে তাকে লালন-পালন করছিল।

কিন্তু এখন দেখ্‌তে পেল যে, আকাশ-কুসুমে আর যাই তৈরি হোক—তাজমহল নির্মাণ করা সহজ নয়। শাজাহান কবি হ'তে পারেন, শিল্পী হ'তে পারেন আর প্রেমিকও হয়ত ছিলেন। তাই বলে তাঁর পকেট ভূপেশের মতো গড়ের মাঠ নিশ্চয়ই ছিল না।

সে দুর্ভাগ্য যদি সম্রাট-কবির হ'ত তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে নিয়ে কবিতা রচনা করবার ফুরসৎ পেতেন কিনা সন্দেহ!

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস শৈলীর বুক ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে চাইল কিন্তু বহু কষ্টে ঢোক গিলে সেটাকে বুকের তলায় পৌঁছে দিলে। তার নিঃশ্বাসের সামান্যতম শব্দও ভূপেশের কানে গিয়ে পৌঁছুক এটা শৈলী এখন একেবারেই চায় না।

পাশ ফিরে সে যে দিকটায় শুয়েছিল সেখানে রয়েছে খণ্ডিত একটি বাতায়ন এবং সেই বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক-ফালি চাঁদ। টুক্‌রো-টুক্‌রো মেঘ সেই চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। চাঁদের সঙ্গে মেঘের এই লুকোচুরির কোনো অর্থ হয়? নীলাকাশে আলু, পটল, বেগুন আর লঙ্কার সেরের হিসেব কেন লেখা নেই?

স্বয়ং বিধাতা বোধ করি হিসেব ভুলে গেছে।

*　　　*　　　*　　　*

দু'বছর পরের কথা।

যে ভূপেশ জীবনে কখনও ছুটি চায়নি আজ তার মুখে ছুটির কথা শুনে স্বয়ং অফিসের বড়বাবুও যেন কেমন হক্‌চকিয়ে গেলেন।

কিন্তু ছুটি আজ ভূপেশের চাই-ই।

বিয়ে হবার পর থেকে আজ দু'বছরের মধ্যে শৈলীকে নিয়ে একদিনের জন্যও সে কোনো সাধ-আহ্লাদ করেনি। সম্প্রতি সে খবর পেয়েছে তার প্রমোশন হয়েছে। মোটা টাকা মাইনে বেড়েছে। এদ্দিন যে মাইনে কম করে ব'লে পোষ্টাফিসে টাকা জমিয়ে এসেছে সেকথা শৈলীকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি।

শৈলী সংসার খরচের জন্যে টাকা চাইলেও সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠেছে। সঞ্চয়ের পরামর্শ দিয়েছে এবং বাজে খরচে যে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয় ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত ক'রে সে কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে।

নাঃ! আর লুকোচুরি নয়।

এইবার সোজাসুজি গিয়ে সত্যিকারের মাইনের পরিমাণটাই শৈলীকে সে জানিয়ে দেবে।

বড়বাবুর চমকিত ভাবটা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছুটিটা আদায় ক'রে নিয়ে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপ্‌কে সে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

যাক—শৈলীকে আজ সে নিতান্তই অবাক ক'রে দিতে পারবে।

দু'গাছা রজনীগন্ধার মালা বৌবাজারের মোড় থেকে কিনে

নিলে। কথায় কথায় শৈলীর এক সখীর কাছ থেকে সে জান্‌তে পেরেছিল যে, শৈলী ডালমুট আর চকোলেট পেলে ছুনিয়ায় আর কিচ্ছু চায় না। কিন্তু পয়সা খরচ হবার ভয়ে ইচ্ছে ক'রেই সে পথে কখনো পা বাড়ায়নি।

আজ যেন ভূপেশ হিসাবহীন…লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে উঠল।

পকেট ভর্তি ডালমুট, চকোলেট, রজনীগন্ধার মালা, একটি দামী শাড়ি আর সিনেমার ছু'টি টিকেট কিনে সে যেন একেবারে উড়তে উড়তে বাড়ী এলো।

মহাভারতে ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যে জবাব দিয়েছিল মন সব চাইতে দ্রুতগামী …আজ যেন ভূপেশ সেই কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারল।

কিন্তু এ কি! সদর দরজা খোলা!

না—না—এরকম ভুলত শৈলীর কখনো হয় না! তার সংসারের সুখ-সুবিধের দিকে শৈলীর প্রখর দৃষ্টি। নিজে না খেয়ে সে স্বামীর জন্য টাকা বাঁচাতে এখন বেশ শিখেছে।

তবে কি ঠিকে-ঝিটা ভুল ক'রে সদর দরজা খুলে রেখে অন্যমনস্ক-ভাবে বেরিয়ে গেছে ?

তাই বা কি ক'রে হবে ? শৈলীর চতুর্দিকে প্রখর দৃষ্টি। স্বামীর যাতে ক্ষতি হয় এমন কাজ সে জীবনে করবে না। ছ'বছর ধরে সেই শিক্ষাই ত' ভূপেশ তাকে দিয়েছে।

তর্ তর্ করে সে দোতলার ঘরে উঠে গেল।

তাই ত'! বাড়িতে কেউ নেউ দেখছি!

ভূপেশ বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকায়!

একটি চিঠি টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া আছে। ভূপেশ সেই দিকে এগিয়ে যায়ঃ

চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত—

"তোমার সংসারের সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি এতদিন খরচ করেছি। আজও সেই জন্যই চলে যাচ্ছি। অন্ততঃ একটা প্রাণীকে আর খোরাক-পোষাক দিতে হবে না। সেই টাকাটা মাসে মাসে পোষ্টাপিসে জমা দিও···আখেরে কাজ দেবে।

আমার আর কোনো খোঁজ ক'রে সময় নষ্ট করো না। তোমার মাইনে বেড়েছে, আমিও খরচ বাঁচিয়ে গেলাম···এবার থেকে আরো জমাতে পারবে।"

খ্যাতনামা রসস্রস্টা সৌখীন খাসনবীশের বাজারে বেশ নামডাক আছে। পূজোর বাজারে হাসির গল্প লেখায় তাঁর নাকি জুড়ি পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক কাগজ থেকেই ফরমাস আসে, এমন একটি হাসির গল্প লিখ্‌তে হবে যা' পড়ে পাঠক-পাঠিকার পেটে-পিঠে খিল ধরে যায়!

বাছা-বাছা চোখা-চোখা কথা সাজিয়ে খাসনবীশ মশাই পূজোর বাজার মাৎ করেন। সৌখীনের কথাগুলি যেন শান্ দেয়া বাণ। পাঠক-পাঠিকার মনে লাগা মাত্র একেবারে Laughing gas অনর্গল বেরিয়ে আস্তে থাকে!

যার লেখায় এত হাসির খোরাক মেলে, সেই সৌখীনবাবু মানুষটি নাকি অতি কাঠখোট্টা—লোকে এইরকমই কাণাঘুষা করে থাকে। সৌখীনবাবুর পাড়ায় যারা বাস করে না তাদের হা-হুতাশের আর অন্ত নেই! তারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, হায় যদি ওই মানুষটির আশে-পাশে থাক্তে পারতাম তবে বাজারে যাবার পথে, ট্রামে ওঠবার মুখে, সিনেমায় যাবার যোগে নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত! হাসি-তামাসার কথাও কি দু' একটা না হত!

সহরের সেরা ডাক্তাররা বিমর্ষ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক সময় সৌখীন খাসনবীশের বই পড়বার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন! তাঁর লেখা "আর্শুলার আস্ফালন," "কুষ্মাণ্ডের কচ্‌কচি," "কুমারিকা থেকে কামস্‌কাটকা," "সিনেমা-ষ্টারের শরশয্যা" প্রভৃতি বই পড়েননি এবং পড়ে হাস্তে হাস্তে সারা গায়ে ব্যথা ক'রে অফিস কামাই করেন নি এমন ব্যক্তি এ যুগে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ।

সুতরাং সেই সৌখান খাসনবীশের চাহিদা যে পূজোর বাজারে বেড়ে যাবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এই লেখকের গল্প নিয়ে নাকি ব্ল্যাক-মার্কেটও চলে!

অনেকগুলো গল্প খাসনবীশ মশাই লিখে ফেলেছেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তার সংখ্যা অতি নগণ্য। Q-এর পাশে যেমন

সদা সর্বদা U বিরাজ করে থাকে, তেমনি পূজো সংখ্যা প্রকাশ করতে গেলে সৌখীন খাসনবীশের গল্প একেবারে অপরিহার্য।

সারা বছর ধরে খাসনবীশমশাই ছোট একটি খাতায় প্লট সংগ্রহ ক'রে থাকেন এবং পূজোর বাজারে অতি চড়া দরে সেইগুলি যথারীতি ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে, রং মিশিয়ে ছেড়ে দেন। অতি মুখরোচক বলে সম্পাদকবৃন্দ সেই রচনাগুলি লুফে নিয়ে থাকেন।

এমন ঘটনাও বহু কাগজে ঘটেছে যে, শেষ মুহূর্তে পাওয়ার দরুণ বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে সম্পাদক মশাই সৌখীন খাসনবীশের গল্প প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

এ বছর বাড়তি যত প্লট ছিল সবগুলিকে কাজে লাগিয়ে খাসনবীশমশাই ঝুড়ি ঝেড়ে অকৃপণ ভাবে সবাইকে বিলি ক'রে ভাব্‌ছিলেন এইবার নিশ্চিন্ত। পূজোর বাজারে আর ফাউণ্টেনপেনে কালি ভরতে হবে না!

কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম!' শেষ মুহূর্তে অনুরোধ এলো 'রসালো' কাগজ থেকে। সম্পাদকের একান্ত অনুরোধ, পূজো সংখ্যায় একটি রসসৃষ্টি করতেই হবে। নইলে পাঠক-পাঠিকাগণ নাকি মারমুখে হয়ে 'রসালো' কার্যালয় আক্রমণ করবে—এই রকম নোটিশ পাঠিয়েছে!

গত বছর সৌখীন খাসনবীশের গল্প ছাড়া পূজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বলে 'রসালো' স্তূপীকৃত হয়ে অফিসে পড়ে আছে, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি! তাই সম্পাদকের সানুনয় অনুরোধ যে, বিলম্বে হলেও তাঁর এই একান্ত মিনতি রাখতেই হবে, নইলে চাক্‌রী রাখাই মুস্কিল হয়ে উঠবে।

সৌখীন খাসনবীশ বিপদে পড়লো। সত্যি ত' কাউকে তার রসসৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না! তার লেখা না পেয়ে যদি একটি কাগজ পটল-উত্তোলন করে তবে সেটা গর্বের কথা হতে পারে, কিন্তু বেঁচে থাক্‌তে এই লজ্জাজনক ঘটনা সে ঘট্‌তে দেবে কেন? কাজেই সৌখীন খাসনবীশ উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লো। বিপদ্ হচ্ছে এই যে, গল্প লেখার জন্য লেখক যখন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, বাড়ীর লোক তখন শঙ্কিত হয়ে দুর্গানাম জপ করতে থাকে।

ছোট ভাই চুপি চুপি বৌদিকে গিয়ে খবর দিলে, বৌদি, সর্বনাশ, দাদা আবার আজ বিকেলবেলা কলমে কালি ভরে নিলে!

বৌদি চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে জবাব দিলে, বল কি ঠাকুরপো, এই যে শুন্‌লাম এ বছর পূজোর লেখা শেষ হয়ে গেল!

আমিও ত' তাই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। কিন্তু সকালের ডাকে 'রসালো' কাগজ থেকে যখন একখানি খামের চিঠি এলো তখনই আমার বাঁ-চোখটা নেচেছিল। ভয়ে ভয়ে ছোট ভাই রঙীণ জবাব দিলে।

বৌদি খিল্-খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'রসালো' কাগজের চিঠিতে তোমার বাঁ-চোখ নাচ্‌তে যাবে কেন?

—তবে শোনো বলি। চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রঙীণ সুরু করে: আজ সন্ধ্যে থেকে তেতলার ঘরে ব্রীজ-টুর্ণামেণ্টটা সুরু হবে ঠিক ক'রে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছি যে! ওদিকে দাদা ফাউণ্টেন পেনে কালি ভরে বসে থাক্‌লো, আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

বৌদি মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলে, বালাই, ষাট! এখনো

আমার লাল টুক্‌টুকে জা আসে নি! এখন কি অমন অলক্ষুণে কথা বলে!

রঙীণ রাগ করে বল্লে, তোমার হাসি আমার ভালো লাগ্‌ছে না!

বৌদি কোন রকমে হাসি চেপে জবাব দেয়, তা হলে ত' রঙীণ ঠাকুরপোর অবস্থা সঙ্গীন বল্‌তে হবে। এই বলে বৌদি ঘরের কাজে অন্যদিকে চলে যায়।

রঙীণ ঠাকুরপোর অবস্থা সঙ্গীন না হোক সন্ধ্যে হতে বাড়ীর ছেলেপুলে থেকে সক্কলকার অবস্থাই যে বিশেষ জটিল হয়ে উঠ্‌ল সে কথা না বল্লেও বেশী বলা হয়!

সন্ধ্যের মুখে বারান্দায় কাগজপত্র সহ সৌখীনবাবু একটি ছোট্ট টেবিল নিয়ে ঘাঁটি আগ্‌লে বসলো।

সৌখীনবাবুর ছোট মেয়ে শিখা বেথুন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার বিশেষ দখল আছে।

গানের ক্লাশ শেষ করে এস্রাজ হাতে সিঁড়ি বেয়ে তরতর্ করে উঠ্‌ছিল; কণ্ঠে তার গানের কলি ঃ

"আমার এ রিক্ত ডালি
দিবো তোমারি পায়ে—"

হাসির গল্পের লেখক খাসনবীশ মশাই উস্‌খুস্ করে উঠ্‌লো। তার পর গানটা নিকটবর্তী হওয়ায় যখন আরো স্পষ্টতর হল, সৌখীন হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো, এই শিখা, তোর রিক্ত ডালির ঠ্যালায় আমার মগজ যে খালি হয়ে যাচ্ছে, একটা প্লটকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম, গেল ফস্ করে পালিয়ে!

সিঁড়িতে এস্রাজ পতন ও ভঙ্গের শব্দ শ্রুত হল, তার পরই মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে শিখার সে কী কান্না।

মা সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, তোমার বাবার গল্প পড়ে এত লোক হাস্‌বে আর তুমি কি না কাঁদছ! ছিঃ! চোখের জল মোছো। অভিমানী মেয়ের কান্না কি কিছুতে থামানো যায়!

শেষকালে কোন একটা হাসির কথা মনে পড়ায় সেই ফোঁপানো কান্নায় ইতি পড়ে!

ওদিকে সৌখীন খাস্‌নবীশ পাতার পর পাতা লিখ্‌ছেন আর মুখ বিকৃত করে ছিঁড়ে ফেল্‌ছেন! প্লট আর কিছুতে জম্‌ছে না। আদরের কুকুর টেংরী একবার পায়ে মুখ ঘস্‌তে এসে তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে!

ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। এ সব মনস্তাত্বিক কোন খবরই তিনি রাখেন না। দোষের মধ্যে মাইনের জন্য সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার ছায়া এসে পড়েছে লেখকের খাতার ওপর।

মুখ না তুলেই সৌখীন চীৎকার করে উঠ্‌লেন, আপনি স্বচ্ছ নন যে আপনাকে ভেদ করে আমি আলো পাবো। সরে পড়ুন এখান থেকে!

মাষ্টার মশাই মুখ কাচুমাচু করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। মাইনে চাওয়া আর সাহসে কুলোলো না। নিশ্চয়ই মাষ্টারমশাই বাসায় ফিরে প্রাণখোলা হাসি হাস্‌তে পারেন নি। খাসনবীশের গল্প পড়লেও হাস্‌তে পারতেন কিনা সন্দেহ!

চাকর এসেছিল ছুটি চাইতে।

সে প্রথমে একচোট ধমকানি খেলো। তারপর তার ওপর হুকুম হ'ল, এই ব্যাটা, আজ সারারাত তোকে আমার সঙ্গে এই বারান্দায় থাক্‌তে হবে। আমি রাত জেগে লিখ্‌বো, আর তুই আমাকে কফি তৈরী করে খাওয়াবি।

কর্তার মেজাজের সঙ্গে চাকর খানিকটা পরিচিত ছিল—ঘাড় কাৎ ক'রে বেচারী চলে গেল!

বারান্দার নানা কোণে পোড়া সিগারেট জমা হ'তে লাগ্‌ল, সিগারেটের ছাই উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল সর্বত্র—সৌখীন বারান্দায় পাগলের মতো পাইচারী ক'রে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল, কিন্তু গল্পের প্লট যেন তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে স্থুরু করল!

কালকে সকালের মধ্যে লেখা দিতেই হবে; নইলে পূজো সংখ্যায় যাবে না! পারিশ্রমিকও লোভনীয়—নগদ পাঁচশত টাকা।

খাসনবীশ মরিয়া হয়ে উঠল। কিসে মানুষ হাসে?

জল-বিছুটি গায়ে লাগিয়ে দিলেও কি পাঠক-পাঠিকারা দন্ত বিকশিত ক'রে হাস্‌বে না?

হঠাৎ দেখা গেল—আশে-পাশের বাড়ীর জান্‌লাগুলিতে ভীড় জমে গেছে! সেখানে ত' সবাই দাঁত বের করে' হাস্‌ছে! ব্যাপার কি?

ওরা কি সবাই গল্পের প্লট পেয়ে গেছে নাকি? ছেলে, মেয়ে, গিন্নি, ন্যাড়া-মাথা কর্তা সবাই এত উল্লসিত হয়ে উঠেছে কেন?

মনস্তত্ত্বের অকূল পাথারে খাসনবীশ থৈ পায় না। এমন সময় গিন্নি এসে সামনে দাঁড়ালো।

সেও কি লেখকের সঙ্গে রসিকতা করবে নাকি?

ভ্রু কুঁচকে সৌখীন স্ত্রীর দিকে তাকালো। স্ত্রী বল্লে, তোমার ভাত কি আজ এখানেই দেবো ?

খাস্‌নবীশ এইবার একেবারে ফেটে পড়ল।

—ভাত! ভাত রান্না করতে তোমায় কে বলেছে ? তুমি কি জান না, গরম লুচি আর চিংড়ি মাছের মালাইকারী না হ'লে আমার মাথায় প্লট আসে না ?

স্ত্রী জবাব দিলে, ঘরে একগুঁড়ো ময়দা নেই, লুচি হবে কোত্থেকে ? আর বাজার থেকে এসেছে পোনা মাছ!

খাসনবীশের মনে হল—সবাই একযোগে তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। কেউ তাকে হাসির গল্প লিখতে দেবে না।

সত্যি এইবার তার কান্না পেতে লাগলো।

হাসির গল্পের আড়ালে যে এত কান্নার বন্যা লুকিয়ে ছিল, এ-কথা সৌখীন খাসনবীশ ইতিপূর্বে ভেবে দেখে নি!

কিন্তু পাঁচ শ' টাকার মায়াও ত' চট্‌ করে ছাড়া যায় না! তারা যেন সবাই একজোট হয়ে দাঁত বের করে ওর নাকের ডগার ওপর তিড়িং লাফ মারতে লাগল!

রাত এগারটা বেজে গেল, কিন্তু প্লট এগোয় নি এক ইঞ্চি!

হঠাৎ একটা বেড়াল ম্যা-ও করে ডেকে উঠ্‌ল।

বাঘের মাসিটাকে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলে মনে হ'ল।

খাসনবীশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আয়নাতে নিজের মুখ দেখ্‌তে লাগল। বেড়ালের মুখের সঙ্গে তার নিজের বড় বেশী সাদৃশ্য আছে বলে মনে হ'ল।

তবে কি সে নিজেই হাস্‌তে ভুলে গেছে? তাই হাসির প্লট তার মগজে আদৌ বাসা বাঁধতে চাইছে না!

আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে খুব হাসতে সুরু করে দিল। হাসলে তাকে এত খারাপ দেখায় কেন? তোব্‌ড়ানো গালের দাগগুলি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরো—আরো জোরে সে মরিয়া হয়ে দাঁত বের করে চীৎকার করে হাসতে সুরু করে দিল।

হঠাৎ পাশের বাড়ীর জান্‌লাটা আবার খুলে গেল। একটা টাক-মাথাওয়ালা লোক ভারী গলায় বল্লে, মশাই, এটা ভদ্রপল্লী, রাত বারোটার সময় মদ খেয়ে হল্লার যায়গা এটা নয়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমরা পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হবো।

খাসনবীশ আবার উচ্চহাস্য করে উঠ্‌ল!

হাসির গল্পের প্লট বিদ্যুৎ-চমকের মতো তার মগজে এসে গিয়েছে। ধন্যবাদ! সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে ওই টাক-মাথাওয়ালা প্রতিবেশীটিকে। ভদ্রলোকের নাম জানা নেই। নইলে তার নাম নিয়েই খাসনবীশ গল্প সুরু করতো!

গভীর রাত···

সৌখীন খস খস করে লিখে চলেছে পাতার পর পাতা। বারান্দাময় কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে···সেগুলিতে কুড়িয়ে জড় করবার সময় পর্যন্ত নেই। পাশে চাকরটা ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডেকে তুলে এককাপ কফি পানেরই বা সময় কোথায় ?

খাস্‌নবীশের কলমে জোয়ার এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

—"মস্তিষ্ক-কোটরবাসী
চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে !"

ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। রাস্তায় জল দেবার শব্দ শোনা গেল। সৌখীন তবু লিখে চলেছে।

সূর্যোদয়ের আগেই তাকে গল্পটি শেষ করতে হবে। লেখকের মনে হল এমন মজাদার গল্প জীবনে সে কখনো রচনা করেনি !

সৃষ্টির অভিনব আনন্দ তার মুখকে দীপ্তিময় করে তুললো। রাত্রি জাগরণের কোনো গ্লানি আর সেই মুখে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সৌখীন শেষ পাতায় ইতি টেনে উঠে দাঁড়াল। সারা বারান্দায় ছড়িয়ে আছে কাগজগুলি। ঠিক যেন বাণীর কমলবনের রাজহংস তার শ্বেতপাখাগুলি ছড়িয়ে রেখে গেছে !

খাসনবীশ ছুটোছুটি করে পাতাগুলি কুড়িয়ে গুছিয়ে নিলে। বেশ বড় গল্প হয়েছে।

একটি আলপিন দিয়ে পাতাগুলির হৃদয় ভেদ করলে। আঙুলে আল্‌পিনের খোঁচায় সে নিজের অজান্তে "উঃ" করে উঠল।

এ কি সৃজনের সফলতায় আনন্দ-ধ্বনি?

সৌখীন সেদিকে আর দৃষ্টিপাত না করে জামা গায় দিয়ে গল্পটা পকেটে পুরে প্রথম ট্রামের জন্যে দরজা খুলে ফুটপাথে নেমে এলো।

সারাবাড়ী তখন ঘুমে অচৈতন্য।

সারারাত মেশিন চল্‌ছে 'রসালো' কার্যালয়ে। সম্পাদক মশাই অতি প্রত্যূষে তন্দ্রাবিজড়িত চোখে ধূমায়িত চা পান করছেন। খাসনবীশকে দেখতে পেয়ে তিনি আর এক কাপ চা তার দিকে ঠেলে দিলেন।

সৌখীনের মনে হল এমন তৃপ্তিদায়ক চা সে জীবনে কখনো পান করে নি।

মুদ্রিত নেত্রে বল্লে, গল্পটা এনেছি।

সংবাদটিতে সে যে আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রতীক্ষা করছিল, সম্পাদকের পক্ষ থেকে তা না পেয়ে চোখ খুলে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইল।

সম্পাদক বল্লেন, দেখুন খাসনবীশ মশাই, একটা কথা বলবার আছে। আপনার বড় গল্প যাচ্ছে শুনে শেষ মুহূর্তে এত বিজ্ঞাপন পেয়ে গেলুম যে, সেগুলি ফেরৎ দেবার আর উপায় রইল না। সারারাত জেগে মেশিন চালিয়েছি। আজ সকালেই 'রসালো' বাজারে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সৌখীন বল্লে, বলেন কি? কিন্তু আমার গল্প? সম্পাদক বল্লেন, উপায় নেই খাসনবীশ মশাই।

সৌখীন বাধা দিয়ে চোখ পাকিয়ে বল্লে, আমি সারারাত জেগে এই গল্প লিখেছি—

শান্তকণ্ঠে সম্পাদক জবাব দিলেন, এ ট্র্যাজেডি জীবনে নিত্য ঘট্‌ছে সৌখীনবাবু। রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'তে তার হদিশ দিয়ে গেছেন—

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি !"

সৌখীন খাসনবীশের মনে হল সম্পাদকের গালে একটি চড় বসিয়ে দেন। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। আঙুলের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে দেখলেন, পিনের খোঁচা লেগে সেখানে খানিকটা রক্ত জমে আছে !
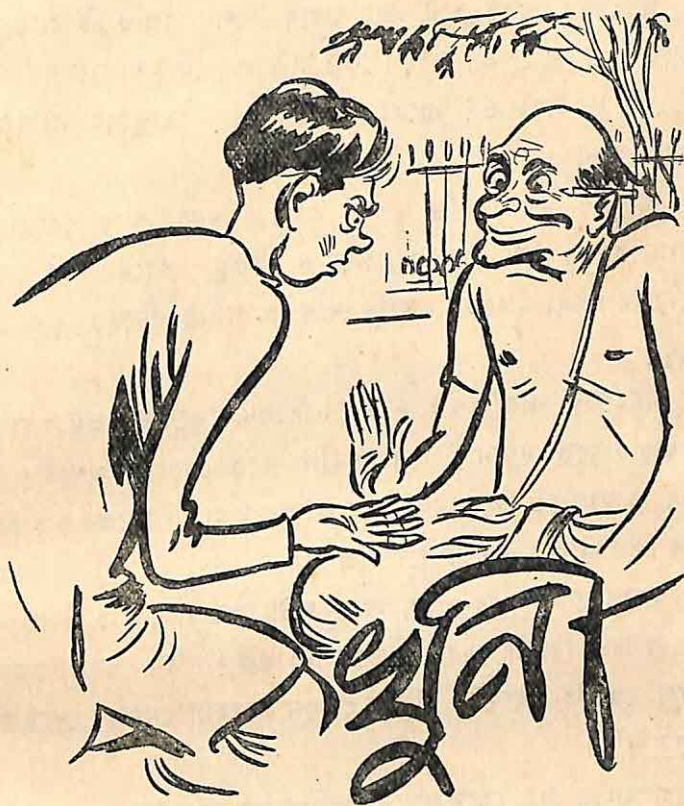
গণৎকারের কাছ থেকে হাতটা টেনে নিয়ে অর্জুন প্রথমটা হো-হো করে হেসে উঠল।

—বলছেন কি আপনি? আমি খুন করবো! নিরীহ স্কুল মাষ্টার আমি। ছেলেদের চড়-চাপড়টা মারি বটে···তাই বলে একেবারে খুন! সত্যি হাসালেন আপনি! এই জন্যই লোকে জ্যোতিষে বিশ্বাস করতে চায় না!

গণৎকার একটু চটে উঠে জবাব দিলেন, বলছি কি আর সাধে মশাই! গ্রহের ফের! নইলে কেউ বা রাজা, কেউ বা পথের ভিখারী হয় কেন! সবই ওই গ্রহের যোগাযোগ! মানুষের সাধ্যি কি যে তা খণ্ডন করে!

অর্জুনও খুব বিরক্তি বোধ করল। বল্লে, আর রেখে দিন আপনার গ্রহের ফের! গণনার কিছু জানেন না, অথচ এসেছেন গণনা করতে! বলুন দেখি আপনার নিজের মৃত্যু হবে কবে?

গণৎকার নাক সিঁটকে জবাব দিলেন, ভেবেছেন ওই কথা বলে আমায় ভড়কে দেবেন? সে গণনাও করে রেখেছি মশাই! ৫৩ বছর ৩ মাস ১৬ দিনের দিন হবে আমার মৃত্যু। নিজের ছক বিচার করে স্থির করেছি—একেবারে অভ্রান্ত।

অর্জুন ব্যঙ্গ করে বল্লে, কত ঘণ্টা, কত পল, কত বিপল—সে সব কথাও বিচারে ধরা পড়েছে না কি! এক কাজ করুন—আগে থেকেই শ্রাদ্ধটা চুকিয়ে ফেলুন, আমরা নেমন্তন্ন খেয়ে হাফ্ ছেড়ে বাঁচি।

গণৎকার মৃদু হেসে বল্লেন, অবিশ্বাসের কোনই কারণ নেই, কত পল, কত বিপল···অভ্রান্ত-ভাবে সে কথাও বলা চলে। দেখি আপনার হাত খানা আরেকবার।

নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অর্জুন তার হাতখানা আবার গণৎকারের দিকে প্রসারিত করে দিলে।

গণৎকার একদৃষ্টে অর্জুনের হস্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেমন নাকি সুনিপুণ মৎস্য-শিকারী ফাতনার দিকে তাকিয়ে

থাকে। ক্রমে তাঁর নাসা স্ফীত হল—ললাট কুঞ্চিত হল—চক্ষু আয়তনে ক্ষুদ্রাকৃতি হল। চোখের চশমা কপালের ওপর তুলে তিনি বল্লেন, যথাযথ সময় জান্‌তে চাইছিলেন না? আপনার হস্ত রেখায় স্পষ্ট রয়েছে আজ রাত্রের মধ্যেই আপনি খুন করবেন।

হো-হো করে অর্জুন রায় আবার হেসে উঠ্‌ল। তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে, যদিও বা জ্যোতিষের ওপর খানিকটা বিশ্বাস ছিল আপনার এই ভবিষ্যৎ-বাণীতে তা একেবারে উপে গেল। আজ রাত্রে আমি খুন করবো? সেটা ত' আর সম্ভবপর হবে না, সুতরাং কাল সকালে এসে আপনাকে খুন ক'রে যাবো। যদি মনের জোর থাকে ত' কাল এখানে উপস্থিত থাক্‌বেন।

হাস্‌তে হাস্‌তে আর মাথা নাড়তে নাড়তে অর্জুন বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে!

বাসায় ফিরেই অর্জুন তার টেবিলের ওপর একখানা চিঠি পেলে। বন্ধু অর্ধেন্দু নেমন্তন্ন করেছে।

এটা একটা সুখবর সন্দেহ নেই।

কেননা অর্ধেন্দু স্ত্রীর নয়নতারা চমৎকার রান্না করে। বেশ ক'রে স্নান ক'রে সে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করলে। তারপর জামা কাপড় পাল্টে ভুরি-ভোজনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

রাস্তায় চলতে চলতে গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী তার মগজে কাজ করতে সুরু করলে। তাইত! আজ রাত্রের মধ্যেই সে খুন করবে—গণৎকার এমন কথা জোর করে বল্‌তে সাহস করলে

কি ভাবে! ওই ত' ওর সামনেই একটা লোক মাথা গুঁজে পথ চল্‌ছে। সে যদি পিছন থেকে জোরে একটা ধাক্কা মারে তবেই ত' লোকটার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘট্‌বে! খুন করা এমন একটা কী শক্ত কাজ!

আরো একটি সহজ উপায় আছে।

মিলিটারী লরী হু-হু শব্দে রাস্তা দিয়ে চলেছে। একটা লোককে একটু ঠেলে তার সামনে ফেলে দেবার যেটুকু সামান্য প্রচেষ্টা। বেশী কষ্টও করতে হয় না সেজন্য।

এই তো দিব্যি ফুটফুটে একটি ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপন মনে খেলা করছে! শুধু একটু বুড়ো আঙুলের টিপুনি!

* * * *

আরে মোলো যা!

সে কী ভাবছে আবোল-তাবোল!

ভদ্র ঘরের সন্তান সে! নিতান্ত নিরীহ স্কুল-মাষ্টার! খামোখা একটা লোককে খুন করতে যাবে কেন?

গণৎকার একটা কথা বলেছে বলেই কি সে খুনী হয়ে গেল!

দ্রুতপদে অর্জুন বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওনা হল। এতক্ষণে বুঝতে পারলে বেশ খিদে লেগেছে তার। পেটে যখন আগুন জ্বলে সেই সময়ই মগজের ভেতর অকারণ আবোল-তাবোল কথার উদ্ভব হয়।

যত বাজে অলস চিন্তা।

অনেক দিন ধরে বাসায় ঠাকুরের রান্না খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে। বন্ধু-পত্নী নয়নতারার রান্নায় হাতযশ আছে। আজ খাওয়াটা ভালই হবে ভেবে অর্জুন পদক্ষেপ দ্রুততর করে দিল।

অর্ধেন্দুর বাসায় পৌঁছে দেখে, আরো সব বন্ধুরা সমবেত হয়েছে এবং সবাই তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে। বন্ধুর দল সমবেত কণ্ঠে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলে—, তারপর অনুযোগের সুরে শুধোলে, আরে! বৌদির হাতের রান্না! তোমার তবু আসতে এত গয়ংগচ্ছ ভাব কেন শুনি? অন্য কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?

অর্জুন বল্লে, আরে না—না। আর যদিও বা নেমন্তন্ন থাকতো তবে বৌদির 'অনারে' সেটা 'ক্যান্‌সেল্‌' করতে আমার এক মুহূর্ত বিলম্ব হ'ত না! আরে ভাই, বৌদির হাতের মাংস আর চাটনি··· সে কি ভোলা যায়! জিভে যেন লেগে রয়েছে!—ওহে অর্ধেন্দু পাত পড়েছে ত'?

অর্ধেন্দু রসিকতা করে জবাব দিলে, পাত প'ড়েছিল বহুক্ষণ আগে, এইবার পাত ফেল্‌বার দরকার। আর বোধ করি সেই জন্যই তুমি সময় মত এসেছ।

হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে সবাই খেতে বস্‌ল।

খাবার মুখে তুলতে গিয়ে গণৎকারের কথাটা আবার অর্জুনের মগজটা নাড়া দিলে! ও যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

নয়নতারা তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বল্লে, রান্না বোধকরি আমার ভালো হয়নি, নইলে অর্জুনবাবু কিছুই মুখে তুলছেন না কেন ?

অর্জুন নিজেকে সচেতন করে তুলে বল্লে, না বৌদি ! রান্না খুব চমৎকার হয়েছে। আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম।

নয়নতারা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে জবাব দিলে, উঁহু ! এটা আমার রান্নার পক্ষে মোটেই 'কম্‌প্লিমেণ্ট' নয়। অপর এক বন্ধু নয়নতারার কথাটাকে সমর্থন করে কইলে, নিশ্চয় নিশ্চয় ! বৌদির রান্না চাখ্‌তে গিয়ে অন্য সব কথা ভুলে যেতে হয়···আমাদের ত' এই-ই ধারণা। নয়নতারা ফোঁড়ন দিয়ে বল্লে, কথা গুলো শুনে রাখ্‌বেন অর্জুন বাবু !

অর্জুনের হঠাৎ মনে হল সেই গণৎকারের কথাটা। এক্ষুণি যদি ও হাতের কাছের কাঁসার গ্লাসটা ছুঁড়ে মারে তবে হয় বন্ধুটি, না হয় নয়নতারা পটল তোলেন··আর সঙ্গে সঙ্গে গণৎকারের কথাটাও সত্যি হয়ে যায়। কিন্তু অনেক করে সে মনকে দমন করলে।

নয়নতারা বল্লে, নিশ্চয়ই অর্জুনবাবু কোথা থেকে খেয়ে এসেছেন —নইলে আপনার এমন অক্ষিদে ত' কোন দিন দেখিনি !

ম্লানমুখে অর্জুন জবাব দিলে আমার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই বৌদি, আপনারা ক্ষমা করুন—আমি উঠি।

অর্ধেন্দু ব্যস্ত হয়ে বল্লে, তুমি আমার বৈঠকখানা ঘরটায় শুয়ে পড়গে। ওরে বৃন্দে, পাখাটা খুলে দে—

পেটে ক্ষিদে থাকা সত্বেও অর্জুন বাইরের ঘরের ফরাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। খাবার ঘর থেকে ক্রমাগত হল্লা-হাসি ভেসে আসতে লাগ্‌ল।

অর্জুন ভাবলে, ওরা তাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা করছে না ত'? মাথায় আবার খুনটা চেপে বসল। নাঃ, গণৎকারের কথাটাই বুঝি আজ সত্যি হবে!

অর্জুন শুয়ে থাক্‌তে পারল না, উঠে বসল।

ঘরের এক পাশে অর্ধেন্দুর ডাম্বেল জোড়া রয়েছে। পরমানন্দে ওরা খাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাসির ফুলঝুরি! নয়নতারাও আজ খুব হাস্‌ছে।

নিশ্চই সবাই মিলে ওকে ঠাট্টায়-ঠাট্টায় মাটিতে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে!

অত্যন্ত মরিয়া হয়ে অর্জুন ডাম্বেলটা হাতে তুলে নিলে।

দেয়ালের গায় আয়নায় ওর ছায়া ভেসে উঠ্‌ল। কী মুখ চোখের অবস্থা তার! ডাম্বেলটা রেখে খস্ খস্ করে অর্জুন একটা চিঠি লিখে অর্ধেন্দুর টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর অর্ধেন্দু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চীৎকার করে বল্লে, সর্বনাশ! অর্জুন কাকে খুন করতে ছুটেছে··· চিঠি লিখে গেছে!

চিঠিখানি পড়ে সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো।

নয়নতারা ব্যস্ত হয়ে বল্লে, নিশ্চয়ই অর্জুনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মুখ চোখের ভাব আমার তখুনি বিশেষ ভালো মনে

হলো না ! ওগো তোমরা যাও—ওকে ধরে ফেল, নইলে একটা কেলেঙ্কারী হবে !

ভরা পেটে বন্ধুর দল তক্ষুনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

অর্জুনকে ওরা যখন আবিষ্কার করলে সে তখন একটা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম থেকে নাম্‌ছিল।

বন্ধুদের দেখে সে দুটি হাত উঁচু করে দেখালো।

একি। তার দু' হাত একেবারে রক্তে রাঙা !

অর্ধেন্দু শিউরে উঠে বল্লে, সর্বনাশ ! কাকে খুন করে এলি অর্জুন !

নিশ্চিন্ত আরামে সে জবাব দিলে, ট্রামের বেঞ্চের প্রায় হাজার খানেক ছারপোকা খুন করেছি। এইবার আমি সত্যি ঘুমুতে পারবো।
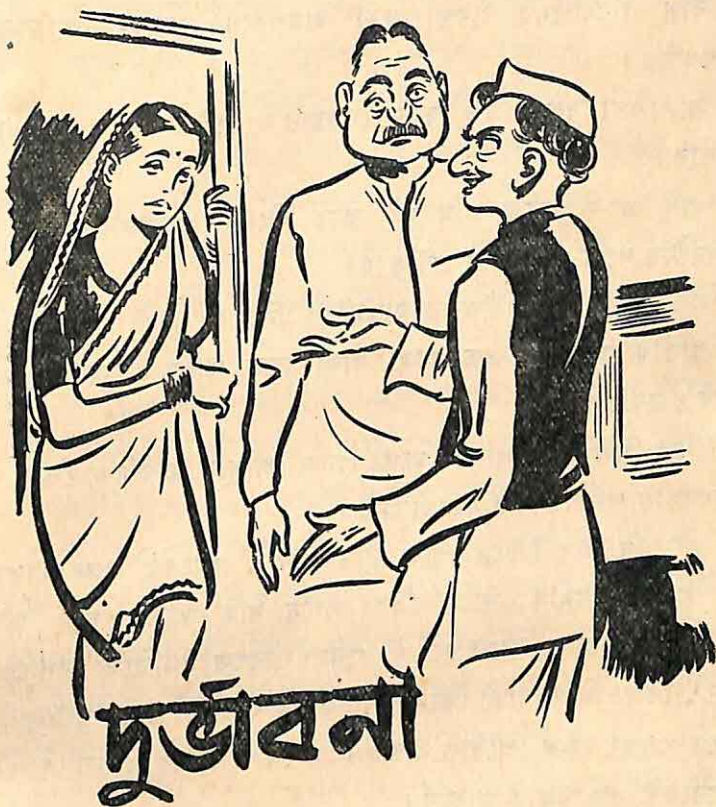
দুর্ভাবনা

রামশরণ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীর বড় বাড়াবাড়ি অসুখ; তাই তাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্তনের জন্যে কল্‌কাতার বাইরে যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার বলেছেন, আজ যেতে পারলে যেন কাল্‌কের জন্য দেরী করা না হয়।

বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা রামশরণের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নয়!

সত্যিকথা বল্‌তে কি তুড়ি দেওয়ার মতোই একটা সহজসাধ্য ব্যাপার।

শুধু একটি চেকে নাম সই করে দিলেই প্রয়োজনীয় টাকা আধঘণ্টার মধ্যে ঘরে এসে পৌঁছুবে।

যত ভাবনা নিজের পৈতৃক বাড়ীটিকে নিয়ে।

বাড়ীর জন্য যে এত মাথা ব্যথা হতে পারে তা' আগে কে ভেবে রেখেছিল?

পিল পিল করে পোকার মতো লোক আস্‌ছে চারদিক থেকে। কল্‌কাতায় পা বাড়াবার যায়গা নেই।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে গেলে প্রতি মুহূর্তে লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগ্‌বার সম্ভাবনা। ট্রামে কিম্বা বাসে যদি উঠ্‌তে চাও ত' বাদুড়-বৃত্তি অভ্যাস করতে হবে। পয়সা থাক্‌লে ট্যাক্সিতে চাপ্‌তে পারো, কিম্বা নিজে গাড়ী কিনে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে ছুটোছুটি করতে পারো, কিন্তু পেট্রোল বাড়ন্ত। ফলে তোমার কেনা গাড়ী গ্যারেজেই গুদোমজাত থাক্‌বে।

বাজারে গিয়ে কোনো জিনিস ছোঁবার যো নেই। দাম শুনলে শক্‌ খেতে হবে।

এই পোকা-মাকড়গুলো কোথায় লুকিয়ে ছিল রামশরণ ভেবে পায় না।

"যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে
হরে মুরারে........"

ভেবে ভেবে রামশরণ দুটো সিগার পুড়িয়ে শেষ করে ফেল্লে ; সেই ভস্মরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, আজ যদি পরিবার নিয়ে বায়ু পরিবর্তনে পাড়ি জমাই, তবে খালি বাড়ী পেয়ে এই পিল-পিলে পোকার দল তার গৃহে এসে আশ্রয় নেবে। চাই কি সরকার বাড়ীটি দখল করে একটি আশ্রয়-কেন্দ্রই খুলে দেবে। ছ'মাস পরে কল্‌কাতায় ফিরে এসে তাকেও ওই পোকা-মাকড়ের দলে নাম লিখিয়ে ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুরে বেড়াতে হবে।

বাড়ী থাকার যে এত বিপদ সেকথা কি তার পিতামহ দুর্গাশরণ ভাবতে পেরেছিল ? স্বর্গত পিতামহ সুখে থাকুন, কিন্তু রামশরণ এই 'বাস্তুভিটা সমস্যায়' তিন রাত্রি ঘুমুতে পারছে না।

বাড়ীটিকে ত' আর বহন করে বায়ুপরিবর্তনে নিয়ে যাওয়া যায় না ! এর চাইতে ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করা ছিল ভালো ! মাস মাস ভাড়া গুণে দিলেই দায়মুক্ত হতে পারত।

দু-একটি আত্মীয়-স্বজনের নাম স্মরণে আন্‌বার চেষ্টা করলো রামশরণ। কিন্তু বিপদ সেখানে আরো ঘনীভূত হতে পারে। ছ'মাসের নাম করে এসে তারা যদি অধিকতর আত্মীয়তায় আপ্লুত হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে তবে তাদের স্থানচ্যুত করবে কি করে ?

এ যে একেবারে জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ !

রামশরণ ঘামে আর ঘন-ঘন সিগার টানে !

হঠাৎ তার শ্যামসুন্দরের নামটা মনে পড়ে গেল। শ্যামসুন্দর রামশরণের কলেজ-জীবনের সহপাঠী। চিরকাল পরের উপকার করে

যাওয়াই তার পেশা। সারাটা জীবন অন্যের দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে বলে নিজের প্রতি আর নজর দেবার সময় তার হয়ে ওঠেনি। সুতরাং সে অকৃতদারই রয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। শ্যামসুন্দরই রামশরণের শ্যাম আর কূল দুই-ই বজায় রাখতে পারবে!

নিশ্চিত হয়ে মুখের সিগার নিভিয়ে ফেলে তিনি নৈশ-উপাধানের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

শ্যামসুন্দর থাকে বেলেঘাটার এক বস্তি অঞ্চলে।

সেখানে সে একটি নৈশ-বিদ্যালয় চালায় আর বস্তিবাসীদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে।

চা-পর্ব সমাধানের পর সকালেই রামশরণ নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করে বেলেঘাটা অভিমুখে রওনা হলো। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে তার একটা সঙ্কোচ বোধ হল। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামশরণের বন্ধু যে বেলেঘাটার বস্তি অঞ্চলে বসবাস করে একথা তার গাড়ীর চালককে জানাবার এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে? নিজের 'প্রেস্‌টিজ্' বলেও ত' একটা কথা আছে। নিজের স্বার্থের খাতিরে বস্তীর অধিবাসীকে খোসামোদ করতে হচ্ছে তার। ধনীর তথাকথিত সম্মানের মোহে এ সব ব্যাপারের সাক্ষী না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একটা সিগার ধরিয়ে রামশরণ দ্রুত অগ্রসর হল। তার বরাৎ ভালো যে শ্যামসুন্দরকে বস্তীতেই পাওয়া গেল। শ্যামসুন্দর মালকোচা মেরে বস্তির ড্রেণগুলিতে কেরোসিন তেল ঢাল্‌ছে। সঙ্গে এক পাল ছেলে।

রামশরণ ধূমকেতুর মতো হাজির হয়ে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার ভারী জরুরী দরকার আছে শ্যামসুন্দর।

রামশরণকে হঠাৎ সেখানে দেখতে পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে জবাব দিলে, আরে! ব্যাপার কি ভাই? গরীবের বাড়ীতে যাকে বলে একেবারে হাতির পা!

—বাজে কথা রাখ শ্যাম, শীগগির আমার গাড়ীতে উঠে আয় দিকি।

রামশরণ বিশেষ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে।

শ্যামসুন্দর বিব্রত বোধ করে। বলে, কিন্তু ভাই, আমি যে একটা দরকারী কাজ করছি। অনেক কষ্টে কর্পোরেশনের কাছ থেকে এই কেরোসিনটুকু পাওয়া গেছে। কাউন্সিলারের কাছে এজন্য ঘুরতে হয়েছে প্রায় দু'মাস।

রামশরণ জানে শ্যামসুন্দরের দুর্বলতা কোথায়। তাই এবার অব্যর্থ শর-সন্ধান করে।

মুখখানাকে বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো করে জবাব দেয়, তোর বৌদির খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। ক্রমাগত তোর কথাই বল্‌ছে। একবার না গেলে চল্‌বে না ভাই।

শ্যামসুন্দর এই বৌদির কাছ থেকে অনেক স্নেহ আর প্রীতি পেয়েছে। যখন তার একেবারে খাওয়া জুটত না—এই বৌদি তাকে পাক্‌ড়াও করে নিয়ে গিয়ে নিজে সাম্‌নে বসিয়ে যে কতদিন খাইয়েছে তার হিসেব মেলে না। তবে শ্যামসুন্দর একটি খবর রাখে না যে, এই সব বাহুল্য ব্যাপারে রামশরণ তখন মনে মনে

অখুশীই হয়েছে! কিন্তু কল্যাণী কারো কথা শোনে নি। এই ছন্নছাড়া দেবরটিকে খাইয়ে তার যে তৃপ্তি হত তাকে সে ঠাকুর সেবার কাজ বলে মনে করত।

রামশরণ ঠাট্টা করে বল্‌ত, দুর্ভাগ্য আমার যে স্বদেশী লোক হতে পারিনি···তাহলে কল্যাণীর কাছ থেকে খাতির-যত্ন পাওয়া যেত।

শ্যামসুন্দর মুখ টিপে-টিপে হাস্‌ত আর কৌতুক করে জবাব দিত, অনেক সময় ছন্নছাড়াদের ওপরই অন্নপূর্ণার কৃপা বর্ষণ হয়। বৌদি তেলে-মাথায় তেল দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

রামশরণ হো-হো করে হেসে উঠে মনের কালো মেঘটাকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করত, কল্যাণী চটে ভ্রূভঙ্গী করত আর শ্যামসুন্দর দুজনকে দেখিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাক্‌ত, যেন জীবনে কোনো দিন কিছু খায় নি!

সেই কল্যাণী বৌদির কাছ থেকে আহ্বান এসেছে। শ্যামসুন্দর কি তা অবহেলা করতে পারে? ছেলেদের হাতে কেরোসিনের টিনটা দিয়ে নির্বিবাদে সে গিয়ে গাড়ীতে উঠল।

যেন মন্তর পড়ে সাপকে একেবারে কাবু করে ফেলা হয়েছে।

কল্যাণীর চেহারা দেখে শ্যামসুন্দর একেবারে আঁৎকে উঠ্‌ল। তবু ঠাট্টা করে বিষয়টাকে হাল্কা করবার জন্য বল্লে, রামশরণ আপনাকে খেতে দেয় না—একথা ত' কখনো শুনিনি। প্রদর্শনীতে দেবার মতো চেহারা করে তুল্লেন কি করে?

কল্যাণী বল্লে, বিশ্বের খবর নিয়ে যে সব সময় চিন্তিত, আমাদের কথা মনে রাখবার সময় তার কৈ?

কল্যাণীর কথাটাকে চাপা দেবার জন্য শ্যামসুন্দর বলে উঠল, আপনি স্মরণ করেছেন বলেই ত' তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম।

—আমি স্মরণ করেছি ? কল্যাণীর চোখে-মুখে বিস্ময়।

রামশরণ দেখলে সব কথা এক্ষুণি ফাঁস হয়ে যাবে—আর তার সমস্ত প্ল্যান ডুবে যাবে অগাধ জলে। তাই সিগারে একটা টান দিয়ে বল্লে, তোমার অসুখের খবর পেয়ে ও চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে নাকি ? রাস্কেলটা সত্যি বিশ্বের উপকারেই মত্ত ছিল। আমিই ত' ধরে নিয়ে এলাম।

শ্যামসুন্দর বল্লে, আপনার শুশ্রূষার ভার আমি নিলাম বৌদি। আপনাকে ভালো করে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

রামশরণ দেখ্‌লে—সমস্ত ব্যাপারটাই 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়ে যাচ্ছে। এভাবে খাল কেটে কুমীর আন্‌বার পক্ষপাতি সে নয়। চট্‌ করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, শ্যাম, কল্যাণীর চিকিৎসা সম্পর্কে তোর সঙ্গে আমার জরুরী পরামর্শ আছে। আয় ত' আমার সঙ্গে—

শ্যামসুন্দরকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই রামশরণ তাকে নিয়ে বসবার ঘরে চলে গেল।

সেইখানে নিরাপদ গণ্ডীতে বসে সে খুলে বল্‌ল তার প্ল্যান।

শ্যামসুন্দর জবাব দিলে বেশ ত'! ডাক্তার যখন বলেছে, বৌদিকে নিয়ে কালই চেঞ্জে চলে যাও। বাড়ীর ভার আমি নিলাম, তোমার কোনো চিন্তা নেই। ঘরগুলো সব তালা বন্ধ করে চাবি আমার কাছে দিয়ে যেও। মাঝে মাঝে খুলে আমি চাকরদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে রাখ্‌বো।

এইবার রামশরণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সেইদিন রাত্তিরে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারলে।

কল্যাণীকে নিয়ে রামশরণ গিরিডি চলে গেছে।

বিরাট বাড়ীতে শ্যামসুন্দর একা। দুটি চাকর অবশ্য আছে। তারাই বাড়ী ঝাড়-ঝোপ করে আর শ্যামসুন্দরকে রান্না করে খাওয়ায়। কল্যাণী কোনো ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ রেখে যায় নি। রোগশয্যায় শুয়েও সকল দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

খালি বাড়ীতে শ্যামসুন্দরের আর সময় কাটতে চায় না। তারপর একদিন হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে সে প্রবন্ধ লিখতে বসে গেল। পূর্ববঙ্গবাসীরা কেন বাস্তুভিটা ত্যাগ করে দলে দলে কলিকাতায় চলে আসছে এই হচ্ছে প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

লেখাটি যখন প্রায় অর্ধসমাপ্ত তখন হঠাৎ একদিন বাড়ীর দোর গোড়ায় সত্যেশের সঙ্গে তার দেখা। সত্যেশ বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয়দানের কাজে দিনরাত পরিশ্রম করছে—তার নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই! সর্বদা ব্যস্ত-বাগীশ···দাড়ি কামানর ফুরসৎ তার কদাচিৎ মেলে!

মোটা চশমার ফাঁকে ব্যস্ত চোখ সব সময় উঁকি মারে। সত্যেশ অবাক্ হয়ে বল্লে, আমরা তোকে গরু খোঁজ করে মরছি আর তুই এখানে পালিয়ে রয়েছিস্ হতভাগা? Coward! কি করছিস্ এখানে শুনি?

অপরাধীর মত শ্যামসুন্দর জবাব দিলে, কেন সবাই বাস্তুত্যাগ করে আস্‌ছে সেই সম্পর্কে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছি।

প্রবন্ধ ! সত্যেশ যেন সাততলা বাড়ীর ওপর থেকে ফুটপাতের ওপর পড়ে হাড়গোড় ভেঙে ফেল্লে।

প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে কাজ করে সমস্যার সমাধান করা যায় না—প্রবন্ধ লিখে সেই জটিল গ্রন্থি সে খুল্‌তে চায় ?

হাল্কা হাসি দিয়ে সত্যেশ শ্যামসুন্দরের গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের 'গ্র্যাভিটি' নষ্ট করে দিলে।

সত্যেশ একবার বাড়ীটার দিয়ে তাকিয়ে বল্লে, এই বাড়ীতে তুই থাকিস্ ?

—হুঁ

—বাড়ীটা কার শুনি ?

—আমার এক বন্ধুর। তারা চেঞ্জে গেছে।

সত্যেশ যেন 'ইউক্লিডের' এক জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। বল্লে 'ইউরেকা'। তারপর শ্যামসুন্দরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে, ঘরে বসে কাগজ-কলম নষ্ট না করে আমার সঙ্গে চল—শেয়ালদা' ষ্টেশনে। দেখ্‌বি কত পরিবার না খেয়ে পড়ে আছে। কত শিশু দুধ পাচ্ছে না, কত লোক সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়েছে।

শ্যামসুন্দরের ভেতরকার কর্মী-মানুষটা হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। বল্লে, নিশ্চয়ই যাবো।

সত্যেশ জবাব দিলে, শুধু গেলে হবে না, তাদের এই বাড়ীতে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

রামশরণের গম্ভীর মুখটা তার মনের আকাশে ভেসে উঠ্‌ল। সে একটু ভয় পেয়ে গেল।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র।

তার পাশেই সে দেখ্‌তে পেলে কল্যাণীর কল্যাণময়ী মূর্তি।

শ্যামসুন্দর তার সমস্ত দ্বিধাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বল্লে, ঠিক কথাই বলেছিস সত্যেশ! প্রবন্ধ লিখে তাদের ভিটে ছেড়ে আসবার প্রকৃত কথা জানা যাবে না! তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশতে হবে। তুই চলে যা ষ্টেশনে। আমি ততক্ষণ চাকরদের দিয়ে ঘরগুলো খুলে ফেলে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দি—

সত্যেশের ক্যারামতি আছে বলতে হবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে লম্বা, বেঁটে, কুঁজো, খোঁড়া, বাতে-পঙ্গু, অর্ধমৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ধাঁচের আর ঢঙের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় বাড়ীখানি পূর্ণ করে ফেল্লে। এ ছাড়া শিশুর দল ত' আছেই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের কোলাহলে আর কলরবে মনে হল বাড়ীতে বুঝি রথের-মেলা বসে গেছে।

চাকর দুটি বাবুর কাণ্ড-কারখানা দেখে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রান্না ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর সকলের ইতিহাস আবিষ্কারে তৎপর হয়ে উঠেছে। কে কোথা থেকে এসেছে, কার কত জোত জমি ছিল, কি জাতীয় অত্যাচারে তারা ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে··· এই সব চাঞ্চল্যকর কাহিনী—যা নাকি উপন্যাসের চাইতেও উদ্দীপনাময়!

সত্যেশ কিন্তু আরো প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সরকার থেকে রেশনের ব্যবস্থা করে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি নিয়ে আস্‌ছে ভারে ভারে!

বাড়ীতে যেন মহোৎসব লেগে গেল।

শ্যামসুন্দরও কম যাদু জানে না।

চাকর দুটিকে মিষ্টি কথায় বশ করে তাদেরই লাগিয়ে দিয়েছে রান্না ঘরের কাজে।

দাউ-দাউ করে উনুন জ্বলছে।

কচাকচ্ তরকারী কোটা হচ্ছে···

টগ্‌বগ্ চাল ফুটছে···

ঝপাঝপ্ জল মাথায় পড়ছে···

ঠকাঠক্ খুন্তি কড়াইতে নড়ছে···

হ্যাঁ, যজ্ঞিবাড়ী বল্‌তে হবে বৈ কি!

কিন্তু শ্যামসুন্দরের ধনুকভাঙা পণ।

কেউ বসে খেতে পারবে না।

তাই মেয়েরা ঝুড়ি তৈরী করছে, ঠোঙা বানাচ্ছে, চামড়ার ব্যাগ তৈরী করছে, শেলাই করছে, ছবি আঁকছে; আর ছেলেরা বই বাঁধাচ্ছে, চটের থলি তৈরী করছে, রবার ষ্ট্যাম্প বানাচ্ছে, তুলোট কাগজ তৈরী করছে—এমনি কত কি কাণ্ড···

গোটা বাড়ীখানা যেন কারখানা হয়ে উঠেছে···

শ্যামসুন্দর আর সত্যেশের স্নান-খাওয়ারও সময় নেই। সরকারী পরিদর্শক এসে বলে গেছে—এইটেই হচ্ছে—সেরা আশ্রয়-প্রার্থীর শিবির। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের পরিমাণও বেড়ে গেছে অনেকটা।

ওদিকে গিরিডি থেকে রামশরণ ক্রমাগত চিঠি লিখে জবাব না পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠল।

কল্যাণী বল্লে, যাওনা—একবার ঘুরে এসো। তোমার বন্ধু বেঁচে আছে, কি মরে গেছে সেটাও ত' খবর নেয়া দরকার।

রামশরণ বল্লে, তুমিও ত' ভালো হয়ে গেছ। যেতে হয় তুজনে এক সঙ্গেই যাবো। কল্‌কাতা ছেড়ে আর আমি থাক্‌তে পারছিনে।

স্বামী-স্ত্রী বাড়ীতে পদার্পণ করে একেবারে অবাক!

খবর পেয়ে শ্যামসুন্দর ছুটে এসে বল্লে, বৌদি, আপনারা চলে এসেছেন! বেশ হয়েছে। আপনার শরীর ত' দিব্যি ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু এ বাড়ীতে সবাই খেটে খায়, আপনাকে কিন্তু হেঁসেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতে হবে।

কল্যাণী একবার স্বামীর দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল।

এইবার রাম-শরণের হুঁস হল। চীৎকার করে বল্লে, আমার বাড়ীটাকে ধর্মশালা করে তুলেছিস্? আচ্ছা, আমার নাম রামশরণ....দেখে নেব তোকে।

এই বলে সে ঝড়ের মতো বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জান্‌তে পেরেছি যে, রামশরণ উকিলের পরামর্শ নিচ্ছে—শ্যামসুন্দরের নামে মাম্‌লা দায়ের করবে। অভিযোগ—সে তার গৃহ আর গৃহিণী অবৈধভাবে কেড়ে নিয়েছে। নিক্তির ওজনে সে বিচার চায়। ফাইল তৈরী হচ্ছে।

চাঞ্চল্যকর মামলা সন্দেহ নেই।

আমরা ফলাফল জান্‌বার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি। পাঠক-পাঠিকারাও সংবাদপত্রের পাতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।

অবশেষে

তরুণ শিল্পী করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল সকাল থেকে নতুন টিউব খুলে, প্যালেট্ ভর্তি রঙ নিয়ে ক্যানভাস্ সাজিয়ে বসে আছেন। তরুণী গায়িকা মঞ্জুলিকা মিত্রের পোর্ট্রেট আজ সুরু করতে হবে।

বালিগঞ্জের এক জলসায় মঞ্জুলিকার সঙ্গে করঞ্জাক্ষের পরিচয় হয়। সাত দিনের মধ্যে সেই পরিচয় সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

সামনে বড় দিনের মরশুমে কলকাতার বাজার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে মশগুল হয়ে থাকবে। শিল্পী করঞ্জাক্ষের একান্ত বাসনা, তরুণী

মঞ্জুলিকার একখানি ছবি এঁকে কোনো প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করেন।

মঞ্জুলিকার অবসর অত্যন্ত কম। গানের মজলিসে, রেডিওর আসরে, রেকর্ডের কাজে, সিনেমার প্লে-ব্যাকে, বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে মঞ্জুলিকা সর্বদাই অতি ব্যস্ত।

পর পর অনেকগুলি দিনকে হালকা হাওয়ায় বইয়ে দিয়ে করঞ্জাক্ষ আজকে এই বিশেষ দিনটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে রেখেছেন ওর ছবি আঁকবেন বলে। মঞ্জুলিকাও স্মিত-হাস্যে কথা দিয়েছে, আজকের সমস্তটা দিন শিল্পীর স্টুডিওতে কাটিয়ে যাবে। শিল্পী করঞ্জাক্ষ আগের দিন থেকেই সকল রকমে প্রস্তুত হয়ে আছেন। সিটিং দিতে দিতে যদি অবসাদ আসে তবে শিল্পী মঞ্জুলিকাকে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শোনাবেন। মাঝে মাঝে মঞ্জুলিকার রেকর্ডগুলি বাজিয়েও ওকে অবাক করে দেবার একটা পরিকল্পনা শিল্পীর মগজে বাসা বেঁধে আছে। খুব নাম করা একটি হোটেলে দু'জনের জন্যে দামী খাবারের অর্ডার দেয়া হয়েছে।

মঞ্জুলিকা ফুল ভালোবাসে।

তাই নিউ-মার্কেট থেকে নানা জাতের ফুল আর তোড়া এসেছে ...সুগন্ধী এবং গন্ধহীন। নানা আকারের রূপ লাভ করা সেই পুষ্পগুচ্ছগুলিকে সাজানো হয়েছে নানা যায়গায়। যাতে এই ফুল দেখেই মঞ্জুলিকার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে! সেই মধুর হাসি অক্ষয় হয়ে থাকবে ক্যানভাসের বুকে! মোনোলিসার হাসিকে আজ হারিয়ে দেবে শিল্পী করঞ্জাক্ষ।

* * *

নবীন অধ্যাপক বীরেশ্বর বটব্যাল।

প্রাচীন মূর্তির মধ্যে ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া কাহিনী আবিষ্কার করে বেড়ান। মঞ্জুলিকার মূর্তি সংগ্রহের 'হবি' আছে। সেই সূত্র ধরে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ।

আজ অধ্যাপক বটব্যাল যাচ্ছেন, সারনাথে পাওয়া কি একটি প্রাচীন মূর্তির আলোক-চিত্র তুলে আনতে। কথা আছে মঞ্জুলিকা যাবে তাঁর সঙ্গে।

অধ্যাপক নিরস পুঁথি ঘাটার ভেতর যেন কলা-লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছেন। তাই একান্ত আগ্রহে দুটি বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছেন। আজ রাত্রে ওরা দুটিতে যাত্রা করবেন। নিরুদ্দেশ যাত্রা অবশ্য নয়, পথের শেষ আছে···কিন্তু অধ্যাপক মনে মনে কামনা করছেন সে পথ যেন না ফুরোয়! সকাল থেকে যাত্রার তোড়-জোড় চলছে। টিফিনকেরিয়ার ভর্তি মুখরোচক খাবার নিয়েছেন সঙ্গে। খালি পেটে আলোচনা জমে না, তা কবিতারই হোক, আর ইতিহাসেরই হোক।

*　　　　*　　　　*

নতুন গানে সুর দিয়েছেন সুর শিল্পী পল্লবকুমার। এই গান খানি মঞ্জুলিকার কণ্ঠে কেমন শোনাবে অনুমান করে সুরশিল্পী ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়ে উঠছেন। আপন মনেই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিচ্ছেন।

মঞ্জুলিকা আগ্রহ করে চিঠি লিখছে। আজ নীরব দুপুরে এসে গান খানি গলায় তুলে নেবে। সেই গান সে গাইবে বিভিন্ন আসরে, ছড়িয়ে দেবে বেতারের তরঙ্গে-তরঙ্গে, অক্ষয় করে রাখবে রেকর্ডের বুকে। আর কোনো চিত্র-পরিচালক যদি সুপ্রসন্ন হন তবে একখানি

নতুন ছবিতে এই বিশেষ গানখানি মঞ্জুলিকাকে দিয়ে প্লে-ব্যাকে গাওয়ানো হবে।

মনে মনে একটা মধুর আমেজের সঙ্গে ফাইভ পারসেণ্ট রয়ালটির অঙ্ক কসছেন—সুরশিল্পী। (ইনি অঙ্ক কসতে থাকুন—আমরা সেই অবসরে অন্যত্র গমন করি।)

* * *

টি, পি, সরকার জুয়েলারের দোকান

টি, পি, সরকার অবশ্য এখন বেঁচে নেই—যদিও তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। টি, পি, সরকারের নাতির বড় ছেলে এখন দোকানের মালিক। সেণ্ট্রাল এভেনিউ-এ বিরাট শো কেস। পথ চলতে পথিকেরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকে।

তরুণ জুয়েলার রত্নমণি সরকার আপনার খাস-কামরায় বসে মৃদুস্বরে শীষ দিচ্ছেন।

মঞ্জুলিকার সঙ্গে তাঁর আলাপ এই গয়না তৈরীর ব্যাপার নিয়েই। এখন ঘনিষ্ঠতা এত বেশী হয়ে গেছে যে, সম্বোধনের ব্যাপারে তুমির পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে।

হঠাৎ কি মনে করে রত্নমণি সরকার টেলিফোনের চোঙটা হাতে তুলে নিলেন।

—বড়বাজার ডবল জিরো থ্রি—

—কে কথা বল্‌ছেন ?

—ও ! মঞ্জু ! আমি রত্নমণি !

—কি খবর ? হঠাৎ টেলিফোন যে !

—একেবারে নতুন প্যাটার্ণের নেক্‌লেস তৈরী হয়ে এসেছে।

তোমার গলায় না উঠলে এর আসল চেহারা যাচাই করা যাবে না।

—বল কি! এই যে সেদিন মুক্তোর মালা দিলে!

—সে কথা আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। আজ সন্ধ্যেবেলা দোকানে আসবে একবার?

—না, না। যখন ক্যাশমেমো কাট্‌বে না—দোকানের লোকগুলো প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। সে ভারী বিচ্ছিরী হবে!

—আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ওটা নিয়ে আমি লাইট হাউসে যাচ্ছি। সন্ধ্যে ছটার শো।

—কিন্তু সিট্‌ পাবে কি? আজকেই নতুন ছবি খুলছে।

—সেজন্য তুমি ভেবো না লক্ষিটি! এক্ষুনি আমি ফোনে বুক্‌ করে রাখছি।

—আচ্ছা।

—মনে থাকে যেন। সন্ধ্যে ছ'টার শো। লাইট হাউসে।

—থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং! ইউ আর সো স্যুইট!

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার শীষ দিতে লাগলো রত্নমণি সরকার।

* * *

ইম্প্রেসারীও হিসাবে কলকাতায় অভিজাত মহলে বিক্রম বন্দ্যোর খ্যাতি ও সুনাম দুই-ই আছে। শহরের তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় তাঁর কল্যাণে বহু রকম নাচ দেখে নয়ন-মন চরিতার্থ করে থাকে।

হঠাৎ বন্দ্যোর ছোট্ট সবুজ রঙের গাড়ী খানি এসে দাঁড়ালো মঞ্জুলিকার দোর গোড়ায়।

মঞ্জুলিকার চোখে-মুখে বিস্ময়। শুধোলে, কি খবর? এমন অসময়ে চাঁদের উদয় যে!

বিক্রমের এতটুকু অপেক্ষা করবার ফুরসৎ নেই। মঞ্জুলিকার ডান হাতে এক গোছা কার্ড গছিয়ে দিয়ে বল্লেন, শোনো জরুরী দরকার তোমাকে। আসছে কাল রবিবার সকালে জাপানী নর্তকী মা সোয়ে তাঁর ডান্স দেখাচ্ছেন। তোমায় কিন্তু উদ্বোধনী-সঙ্গীত গাইতে হবে। কার্ড দিয়ে গেলাম। যাকে-যাকে ইচ্ছে সঙ্গে নিয়ে যেও। তাছাড়া আমি ত' লবীতে হাজির থাকবোই।

মঞ্জুলিকা হাসিখুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে উত্তর করলে, জাপানী মেয়ের নাচ! সামনা-সামনি কক্ষনো দেখি নি! শুধু ছবিতেই দেখেছি। সত্যি বলছ ত' বিক্রম?

বিক্রম বন্দ্যো চোখ দুটো একবার নাচিয়ে বল্লে, সত্যি নয় ত' কি তোমার কাছে বাজে কথা বলবার লোক আমি? জাপানী নাচের আগে কিন্তু চাই তোমার গলার গান।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়। গান আমি শোনাব বৈ কি। একেবারে নতুন একটা গান তুলেছি। মনে হবে, তোমাকে বলছি আমি কানে-কানে। সেই গান শুনিয়ে দেবো সবাইকে।

একটুখানি থেমে মঞ্জুলিকা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কোথায় হবে—তাতো কিচ্ছু বল্লে না?

ডান হাতের চেটোটা মঞ্জুলিকার মুখের সামনে উল্টে দিয়ে ত্রিপাঠি বল্লে, এ সব নাচ নিউ এম্পায়ার ছাড়া আর কোথায় জমে

বলো ? কার্ডে সব লেখা আছে। একবার কষ্ট করে চোখ বুলিয়ে নিও লক্ষ্মিটি !

—তা না হয় নেবো। কিন্তু সময় মত আমার কাছে গাড়ী পাঠাবে ত ?

—হ্যাঁ ভালো কথা মঞ্জু। আমি ওদিকে জাপানী পার্টিকে নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত থাকবো। ওদের ড্রেসই আসবে সাতটা প্যাকিং বাক্স ভর্তী। সত্যি, গোলমালে হয়ত সময়ের ঠিক থাকবেনা। তুমি একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যেও। আমি বুকিং অফিস থেকে টাকা দিয়ে দেব। তুমি কোনো অসুবিধেয় পড়বেনা লক্ষ্মিটি ! কিন্তু তুমি না গেলে আমি পড়ব একেবারে অগাধ-জলে। উদ্বোধন-সঙ্গীত না হলে ত' আর "ফাঙ্‌সন্‌" সুরু হতে পারে না !

মঞ্জু মিটি-মিটি হেসে উত্তর দিলে, O. K.

সাঁ করে বিক্রম বন্দ্যোর গাড়ী বেরিয়ে গেল।

* * *

চিত্র-পরিচালক ধুরন্ধর মালাকারের নতুন পৌরাণিক চিত্র "মা বাসুকীর" আজ মহরৎ-উৎসব।

ধুরন্ধরের একান্ত বাসনা যে, অতি পরিচিত মুখগুলিকে সুযোগ না দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা মেয়েকে তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিষিক্ত করবেন।

মাটি যখন কাদার মতো নরম থাকে তখন যে কোনো ছাঁচে তাকে গড়ে তোলা যায়। সেই নরম কাদার সন্ধান পেয়েছেন তিনি তরুণী সুদর্শনা মঞ্জুলিকার মধ্যে।

মঞ্জুও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর পরিকল্পিত নতুন ছবিতে শুধু কণ্ঠই দেবে না—কায়াও দান করবে স্বচ্ছন্দচিত্তে।

আজকের মহরত-এর একটি দৃশ্য গৃহীত হবে মঞ্জুলিকাকে কেন্দ্র করেই। পরিচালক এই আবিষ্কারের কথা সাংবাদিকদের পূর্বাহ্নে জানিয়ে রেখেছেন। সবাই আজ উৎসবে সাগ্রহে যোগদান করবেন নব-তারকার উদয় অবলোকন করতে।

শিল্প-নির্দেশক মঞ্জুলিকার জন্যে সম্পূর্ণ অজন্তা প্যাটার্ণে পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন। অবশ্য প্যাটার্ণটা অজন্তার অনুকরণে হয়েছে কিনা সেকথা অনুমান করা কষ্টসাধ্য! এই পরিচ্ছদ পরিধান করে তন্বী মঞ্জুলিকাকে কেমন দেখাবে সেই ছবি মনে এঁকে নিয়ে চিত্র পরিচালক ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত হয়ে উঠছেন!

চিত্র পরিচালক ধুরন্ধর স্বপ্ন দেখতে থাকুন, আমরা এই অবসরে আর একটু এগিয়ে যাই—

ঘনশ্যাম দত্ত বেলেঘাটা অঞ্চলের নামকরা ধনী।

বিপত্নীক বটে তবে প্রচুর টাকার মালিক।

বহুকাল থেকে গোপনে মনোমত পাত্রীর সন্ধান করছিলেন।

তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা, তিনি প্রতি সন্ধ্যায় চক্ষু মুদে আলবোলা টানবেন আর স্ত্রী তাঁর পাশে বসে গান শোনাবেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলেন, তা হলে শোবার ঘরে একটি দামী রেডিও সেট্ রাখো না কেন?

—উঁহু! উত্তর করেন ঘনশ্যাম দত্ত। শুধু গান শুনলেই ত' হবে না। চুলের গন্ধ আর সাড়ীর খস্ খস্ আওয়াজও মাঝে মাঝে পাওয়া চাই তাহলেই না অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া মনে আমেজ আনবে।

একটি গানের আসরে সম্প্রতি মঞ্জুলিকাকে দেখেছেন দত্ত মশাই। চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়েছে দর্শনে এবং কর্ণে সুধা ঢেলেছে কণ্ঠের-সঙ্গীত। সেইজন্যে লোক লাগিয়ে তিনি মেয়েটির ঠিকানাও সংগ্রহ করেছেন। পালটি ঘর—কোন কিছুতেই আটকাবে না।

নায়েবকে ডেকে চুপি চুপি বল্লেন, সম্বন্ধ উত্থাপন করে আজই একটা চিঠি লিখে দিন।

নায়েব ঘাড় কাত করে উত্তর দিলেন, যে আজ্ঞে—

ঘনশ্যাম দত্ত একটা হাই তুলে আবার বল্লেন, হ্যাঁ, পুনশ্চ দিয়ে লিখে দিন যে, বর পণের জন্য আটকাবে না। গা-ভরা গয়না দিয়ে সাজিয়ে আমরা কনে ঘরে তুলবো—

নায়েব বিগলিত হয়ে বল্লেন, যথার্থ।

আড় চোখে নায়েবের দিকে একবার তাকিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন, চিঠিতে টিকিট আঁটতে ভুলবেন না যেন! আপনার যে ভুলো মন!

নায়েব হাত কচলে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে না! হুজুরের এত

দিন পর যখন সুমতি হয়েছে তখন প্রজাপতি স্বয়ং আমার সহায় হবেন।

* * * *

পরদিন সকালবেলাকার দৈনিক কাগজগুলিতে এই সংবাদটি অনেকেরই চোখে পড়ল—

বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী হরলাল চৌখানী বাঙলা দেশের সুকণ্ঠি তরুণী গায়িকা মঞ্জুলিকা মিত্রকে রেজেষ্ট্রি মতে বিবাহ করিয়া গত কল্যই রাত্রিতে মধুচন্দ্রিমা যাপনার্থ সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। এই নব বিবাহিত দম্পতি বিদেশে থাকাকালে চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। এই আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহে আমরা স্বস্তি-বচন উচ্চারণ করি। নব দম্পতির জীবন-পথ কুসুমাস্তীর্ণ হউক।

কথাটা শুনে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি।

বিশ্বাস না করতে পারলে অবশ্য নিজেকে কোনো মতেই দোষ দেয়া যায় না।

কেননা—কে কবে ভেবেছিল যে, আমাদের শঙ্কর সাহু হঠাৎ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' উচ্চারণ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবে।

অবশ্য জীবহিংসা না করাটা ভালো কাজ, মহৎ কাজ। এ রকম উচ্চাদর্শ সবাইকার মেনে চলা উচিত। কিন্তু তাই বলে আমাদের

দলের 'ভেটার্ণ' মাংসাশী শঙ্কর সাহু দরবিগলিত নেত্রে একেবারে স্বয়ং বুদ্ধদেবকে আলিঙ্গন করে বস্‌বে একথা সুস্থদেহে কল্পনা করাও শক্ত।

এককালে "মডার্ণ-বেঙ্গল" শিক্ষিতা ও আধুনিকা ভার্যা লাভের জন্য রাতারাতি পিতৃদেবের সঙ্গে কলহ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করত! নগদ লাভের লোভে এরকম একটা অসমসাহসের কাজ করা কিছুই নয়, তখন তার পেছনে অর্ধেক রাজত্ব না থাকুক, সুন্দরী রাজকন্যা লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাই বলে একেবারে নিরিমিষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ! পালি ভাষার মতোই বৌদ্ধ-ধর্ম ত' এই হানাহানির যুগে একেবারে প্রাণহীন শবদেহের মতোই পড়ে আছে বল্‌তে হবে।

আমাদের দলের চিরঞ্জীবের শোকটা দেখছি সব চাইতে বেশী উথলে উঠেছে। সে শুধু কাঁদতে বাকি রাখলে।

চোখ-মুখ যতদূর সম্ভব বিষণ্ণ করে বল্লে, আরে ভাই…মাসে একটা করে ফিষ্ট হয় আমাদের…তাতে অমন সুন্দর 'ফাউলকারী' কেউ রাঁধতে পারে না। শঙ্কর সাহু যদি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল তবে 'ফিষ্ট' কথাটার আর কোনো মানে থাকে! তোমরা যে কেউ রান্না করতে যাবে—'ফিষ্ট'টা 'ফাষ্ট' হয়ে দাঁড়াবে! নাঃ, এইবার দেখ্‌ছি তোদের ক্লাবের সদস্যপদ ছেড়ে দিতে হবে।

আমি বল্লাম, চিরঞ্জীব, এত হা-হুতাশ আর অশ্রুপাত করে লাভ কি? আমরা শুধু উড়ো খবর পেয়েছি বৈ ত' নয়! চল, না হয় একবার সরাসরি গিয়ে তদন্ত করে আসা যাক্।

চিরঞ্জীব জবাব দিলে, সেই ভালো।

তু'জনে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

অকালে ঝির-ঝির করে বাদল নেমেছে। আকাশটা থম্‌থমে··· ঠিক আমাদের মনের মতোই মেঘলা আর অন্ধকার।

শঙ্করের বাসায় পৌঁছতে আমরা প্রায় ভিজে উঠলাম। শঙ্কর বাইরের ঘরে বসে বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়ছিল ; আমাদের দেখতে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ খুঁজে পেলো। বল্লে, এই যে ভূপতি···চিরঞ্জীবও আছ দেখছি—এসো—এসো।

চিরঞ্জীব চিরকালের অভ্যাস বশে বলতে যাচ্ছিল—চা আর মাম্‌লেট···কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কথা স্মরণ করে চা আর 'মাম্‌' পর্যন্ত উচ্চারণ করেই চেপে গেল।

চিরঞ্জীবের কথা শুনে শঙ্কর এমন করুণ-নেত্রে তাকালো যে, আমাদেরই কান্না পেতে লাগলো।

শঙ্কর বল্লে, ভাল হয়ে বোস তোরা—! মাম্‌লেটও পাবি, তোদের পক্ষে বাধা নেই। তোরা ত' আর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিস্‌ নি, আমি এক্ষুণি ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চিরঞ্জীব আমার কানে কানে বল্লে, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বৌদি তাহলে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করেনি, আমাদের মতো পাপীদের দলেই আছে।

আমি শুধু বল্লাম, হুঁ! আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কি ভাবে কথা সুরু করা যায়।

শঙ্কর নিজেই সেই অস্বোয়াস্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে সুরু করলেঃ

বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যাবেলা। হাতে কোনো কাজ ছিল না।

আপন মনে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মনে মনে বাসনা ছিল সন্ধ্যের মুখে 'দেলখোস' কেবিনে ঢুকে ফাউল কাটলেটে উদর পূর্তী করে ফিরে আস্‌বো।

হঠাৎ চোখে পড়ল বিজ্ঞপ্তি। বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে জনসভা। এক বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করবেন।

মনে কৌতূহল জাগ্‌ল। সভায় ঢুকে পড়লাম। বৌদ্ধ শ্রমণ তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, "জীব হিংসার কোনো প্রয়োজন নেই। যখুনি কোনো জীব হিংসার প্রবৃত্তি আপনার মনে জাগ্‌বে—মনে-মনে কল্পনা করবেন, এই নিরীহ জীবটি আপনার কোনো পরিচিত লোক, কিংবা কোনো-না-কোনো জন্মের আত্মীয়। তা হলেই হিংসা আপনার মন থেকে দূরে চলে যাবে। এক অনাবিল আনন্দে আপনার চিত্ত ভরে উঠবে।"

কথাটি ভারী মনে লাগ্‌ল। আস্তে আস্তে সভাগৃহ ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ফাউল কাট্‌লেটের তৃষ্ণা কখন যে মন থেকে দূরে গেছে বুঝতেও পারিনি!

তোমরা ত' জানো, প্রত্যহ নিজের হাতে বাজার করা আমার চিরকালের সখ?

পরের দিন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে চলে গেলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! রুই মাছের একটা মাথা দর করতে গেছি···বৌদ্ধ শ্রমণের কথা কানে ভেসে এলো! সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি রুই মাছের মাথার পেছনে আমাদের পণ্ডিত মশায়ের টেকো মাথা উঁকি দিচ্ছে। তোমরাই বলো, তখন কি করে সেই রুই মাছের মাথা কিনে নিয়ে আসি—?

ভাবলাম দুত্তোর ছাই। একটা মুরগী কিনে নিয়ে যাই! অনেক দিন 'ফাউল' চেখে দেখা হয় না! যেই একটা মনোমত মোরগের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি অমনি তার পেছন থেকে ভেসে উঠ্‌ল আমাদের পুরোহিত মহাশয়ের ছবি। সেই লম্বা-লম্বা চুল ঘাড়ের দিকে, নাকটা ছুঁচলো। রাগ করে বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে এক রামছাগলের সামনে পড়ে গেলাম। লোভ পড়েছিল কিনা খেয়াল নেই, কিন্তু দেখি আমাদের পাড়ার জগমোহন তাঁর ছাগুলে দাঁড়ি নিয়ে—তার পেছনে উঁকি দিচ্ছেন!
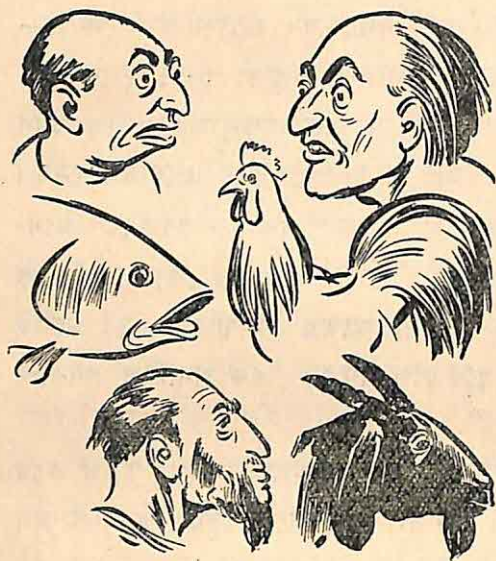
জগৎটাই একেবারে নিরিমিষ হয়ে উঠল। সেই থেকে যেই কোনো গল্‌দা চিংড়ির দিকে কিম্বা পুঁটি মাছের পানে নজর দিয়েছি তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠেছে—আমার মোট্‌কা শ্যালিকা কিম্বা ক্যাংলা সম্বন্ধী। তোমরাই বলো, এরপর আর কি করে আমার আমিষে রুচি থাকে? বল্লে বিশ্বাস করবিনি তোরা, তারপর দিনই গিয়ে বৌদ্ধ-শ্রমণের ঠিকানা সংগ্রহ করলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে

বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিলুম। সেই দিন থেকে শুধু কাচ-কলা-ভাতে খেয়ে আছি। তোদের বৌদি ত' রাগ করে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছে!

বৌদি কিছু অন্যায় করেছে বলে মনে হল না; কেননা শঙ্করের কাহিনী শুনে আমাদের দুই বন্ধুরও বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

[প্রতি বছর আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার অব্যবহিত পরে নানারূপ হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জয়ী ও বিজিত দুই দলেরই সমর্থক দল থাকে। বিভিন্ন দলের হার নিয়েই যে এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। যারা শুধু খেলাকেই ভালবাসেন কোন দল বিশেষের সমর্থক বা অন্ধ-ভক্ত নন, সেই সব পাঠক-পাঠিকা আশা করি নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করতে পারবেন। কল্পনা করা যেতে পারে যে, এই বছর ফাইনাল খেলার পর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছে। কাউকে আঘাত করবার জন্যে নয়, পরন্তু নিছক রস-সৃষ্টির জন্যেই কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ হল।

[স্থান—কুমোরটুলির একটি অঞ্চল। সন্ধ্যা সবে উৎরে গেছে। একটি ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করেন। কর্তা পূর্ববঙ্গের, গিন্নীর বাড়ী কলকাতায়। বাড়ীর গৃহিণী সবে লক্ষ্মীর প্রদীপ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় দরজায় কর্তার হাঁকডাক শোনা গেল।]

কর্তা ॥ ও গিন্নি, শীগ্‌গীর দরজাটা খুল্যা দাও, আর কতক্ষণ দোরগোড়ায় খারাইয়্যা থাকুম ?

গিন্নি ॥ কি জ্বালাতন! মা লক্ষ্মীর কাছে সন্ধ্যেবেলা যে একটু শাঁখ বাজাবো—তার জো নেই! একটু দাঁড়াও বাপু যাচ্ছি!

[দরজা খুলে দিয়েই আঁতকে উঠলো]

গিন্নি ॥ কি সর্বনাশ! এত বড় একটা ইলিশ মাছ দিয়ে আমার কোন্ শ্রাদ্ধটা হবে শুনি ?

কর্তা ॥ আরে, বুঝ্‌তাছ না গিন্নি! আইজকা ইষ্টব্যাঙ্গল জিত্‌ছে, বেশ কইর‍্যা কাঁচা মরিচ দিয়া ইল্‌সা মাছের পাতুরী করো, খাইয়্যা প্রাণডা ঠাণ্ডা করি।

গিন্নি ॥ বটে! তোমাদের ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে আর আমি ইলিশ মাছের পিণ্ডি চটকাবো ? তেমন মেয়ে আমায় পাওনি!

কর্তা ॥ হা-হা-হা! ইল্‌সা মাছের পিণ্ডি চটকাইব্যা ক্যান্! আইজ ত' আনন্দ করণের দিন। পেট ভইর‍্যা খাইয়্যা গলা খুইল্যা গান গামু—

গিন্নি ॥ হুঁ পেট ভরে খেয়ে গলা খুলে গান গাবো ? হ্যাঁ, জিততো যদি আমাদের মোহনবাগান, তবে আমি নিজের হাতে চিংড়ি মাছের মালাইকারী করে খাওয়াতাম—

কর্তা॥ তুমি কও কি গিন্নি? কাঁচা মরিচের লগে এই তর্‌তাজা ইল্‌সা মাছ···অ্যাকেবারে অমর্ত! খাইয়া দেখনা আইজ।

গিন্নি॥ এই রইল তোমার ঘর-সংসার আর রইল তোমার ইলিস মাছ! আমি বাপের বাড়ী চল্লাম—

কর্তা॥ আরে গিন্নি, শুইন্যা যাও, অবুঝ হয়োনা লক্ষীটি— আমারে এমন কইর‍্যা অনাথ কইর‍্যা যাইওনা তুমি—

গিন্নি॥ পেছু ডাকলে আমি গলায় দড়ি দেবো. তখন পুলিশ এসে তোমার হাতেই হাতকড়া পরাবে, হুঁ।

কর্তা॥ হায়-হায়-হায়! আমার এমন ইল্‌সা মাছটা অ্যাক্কে-বারে অদানে-অব্রাহ্মণে গেল!

* * * * *

[স্থান—চিত্রার সামনের ফুটপাত। একটি তরুণী ক্রমাগত পাইচারী করছে আর ঘন ঘন হাত ঘড়ি দেখছে। রাত্রের শো এখুনি সুরু হবে। বেল বেজে উঠেছে। দর্শকেরা ভীড় করে ভিতরে ঢুকছে। মেয়েটি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। এমন সময় দেখা গেল, উস্কোখুস্কো বেশে একটি তরুণ সেই দিকে আসছে]

সন্ধ্যামালতী॥ এ কি সুমন, তুমি এত দেরী করলে কেন? শো বোধ হয় এতক্ষণ সুরু হয়ে গেল!

সুমন॥ সন্ধ্যা, আমি এক্ষুনি হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হচ্ছি—

সন্ধ্যামালতী॥ হাওড়া? কেউ আসবে বুঝি?

সুমন॥ না সন্ধ্যা, আমি বিবাগী হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সন্ন্যাসী হবো বলেই ঠিক করেছি—

সন্ধ্যামালতী॥ (কৌতুক করে) কিন্তু তোমার গেরুয়া কৈ? হরিদ্বারে যাবে বুঝি?

সুমন॥ না সন্ধ্যা, ঠাট্টা নয়। মোহনবাগান হেরে গেছে। জীবন আমার একেবারে ঘষা আধলার মতো হোয়ে গেছে। সংসারে আর আমি থাকবো না।

সন্ধ্যামালতী॥ কিন্তু আমাদের বিয়ে?

সুমন॥ (আঁতকে উঠে) অ্যাঁ! বিয়ে! তুমি বলছ কি মালতী? শোনো সন্ধ্যামালতী, তুমি আমায় ভুলে যাও। ঘর-বাঁধা আর আমার হবে না। এই নাও সিনেমার টিকিট। তু'খানাই আছে। যদি সম্ভব হয় সিনেমা দেখতে দেখতে একটি বান্ধব জুটিয়ে নিও। আমি ফুরিয়ে গেছি!

সন্ধ্যামালতী॥ সুমন, এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে বলত! আমি এলাম পাকিস্থান থেকে—একেবারে আশ্রয়হীনা!······ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল) তোমার সঙ্গে পরিচয় হয় গঙ্গার ঘাটে। আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম···তুমি আমায় বাঁচালে···আশ্বাস দিলে! একটি চাকরীও জুটিয়ে দিলে তুমি। নীড় রচনার স্বপ্ন তুমি জাগিয়ে দিলে আমার অন্তরে! আজ বলছ কিনা তুমি বিবাগী হবে!

সুমন॥ ঠিক কথাই বলেছি সন্ধ্যামালতী! আজ আর আমার চোখে মায়া-অঞ্জন নেই! জীবন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। তোমার জীবন ফুলে-ফলে সুশোভিত হ'য়ে উঠুক এই কামনা জানাই।

সন্ধ্যামালতী॥ কি করে তবে আমি বাঁচবো?

সুমন॥ হতাশ হয়ো না সন্ধ্যা, পাথেয় দিয়ে গেলাম তোমার হাতে। সিনেমার কথা শুনলে আজকের দিনে যে কোনো তরুণ তোমার সঙ্গী হতে রাজী হবে···চাই কি জীবন-সঙ্গী পর্যন্ত। আমায়

তুমি ছেড়ে দাও সন্ধ্যা! ওই সিনেমা টিকিটের দৌলতে তোমার বান্ধব জুটুক, এই কামনা জানাই।

[সুমন মেলোড্রামার নায়কের মতো প্রস্থান করল, আর সন্ধ্যামালতী দুখানি সিনেমার টিকিট হাতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কোন্ তরুণ টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে সর্বহারার মতো দাঁড়িয়ে আছে!]

*　　　*　　　*　　　*

[কাল—সকাল। একটি বাড়ীর সম্মুখভাগ। একটি ছেলে এসে ক্রমাগত কড়া নাড়তে লাগলো। খানিকটা বাদে আর একটা ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে।]

গোবর্ধন॥ কিরে ক্যাবলা, এমন বিহানবেলা কড়া নাইড়ত্যাছিস ক্যান? কাইল রাইতে ঘুমাস নাই?

ক্যাবলা॥ কাল রাত্তিরে ঘুমিয়েছি কিনা সে খবর দিয়ে তোর কি কাজ? আমার লাটিম আর ছবির বই সব ফিরিয়ে দে।

গোবর্ধন॥ আরে! এত চইটত্যাছিস ক্যান? তোর কি অইচে তাই ক' দেহি—

ক্যাবলা॥ আবার জিজ্ঞেস্ করছিস? লজ্জা করে না?

গোবর্ধন॥ লজ্জা? লজ্জা কিসের রে? তুই যে আমারে হকচকাইয়্যা দিত্যাছিস! খুইল্যা ক'—শুনি—

ক্যাবলা॥ আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে! তোদের ইষ্টবেঙ্গল কেন ফাইনালে জিতল শুনি?

গোবর্ধন॥ আরে তাতে কি অইচে রে? ও খেলার কথা ছাইর‍্যা দে—

ক্যাবলা॥ হুঁ! ছেড়ে দেবো। ইষ্টবেঙ্গল তোদের কি আর

আছে? সে ত' পাকিস্থান হ'য়ে গেছে! তবু কেন তোরা···এ তোদের ভারী অন্যায়।

গোবর্ধন॥ আরে ভাই, খেলায় হার-জিত আছেই। তার লাইগ্যা এত কাইজ্যা কিসের? চল ভাই, লাট্টু খেলি গ্যা—

ক্যাবলা॥ না—না! তোর সঙ্গে আর আমি খেলব না। তোরা এসে কোলকাতায় জায়গা পেয়েছিস···আবার ইষ্টবেঙ্গল জিতবে! এ তোদের কেমন বিবেচনা শুনি? দে, আমার লাট্টু, ছবির বই সব ফিরিয়ে দে। তোর সঙ্গে আমার আড়ি—

গোবর্ধন॥ আচ্ছা, ভাই, দিত্যাছি সব ফিরাইয়া—

* * * *

[স্থান—একটি ফ্ল্যাট বাড়ী। পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাট। পরস্পরের সঙ্গে খুব হৃদ্যতা। একটি বাড়ীর ছেলে লাফাতে লাফাতে আর একটি বাড়ীর বৈঠকখানায় এসে হাজির হল। ছেলেটির নাম চঞ্চল। বৈঠকখানায় বসে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন।]

চঞ্চল॥ কাকাবাবু, ও কাকাবাবু—

[কাকাবাবুর মুখে কোনো কথা শোনা গেল না। তিনি নীরবে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন]

চঞ্চল॥ কাকাবাবু, আমার ডাক শুইন্‌ত্যাছ না?

কাকাবাবু॥ (গম্ভীরভাবে) কি বলবি, বল!

চঞ্চল॥ আইজ যে আমার জন্মদিন। তোমাগো সকলের নিমন্তন আমাগো বাড়ী—বাবা কইচেন।

কাকাবাবু॥ হুঁ!

চঞ্চল॥ হুঁ কি কাকাবাবু? আমার জন্মদিনে কি দিবা কও?

কাকাবাবু॥ (হঠাৎ রেগে উঠে) হুঁ। চালাকির আর যায়গা পাওনি! কাল ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে আর আজ তোর জন্মদিন! ওসব চাল আমরা বেশ বুঝি!

চঞ্চল॥ কাকাবাবু, তুমি কও কি? আইজ সত্যি আমার জন্মদিন। মা মিঠাই তৈরী কইর্‌ত্যাচে। তোমাগো খাইতেই অইবো।

কাকাবাবু॥ হুঁ! ফাঁকি দিয়ে আমাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে দেওয়া। কিন্তু ও চালে আমরা ভুলছিনে! বলে দিস, তোদের বাড়ীর সবাইকে—আমরা কেউ ওখানে জল গ্রহণ পর্যন্ত করবো না। হুঁ বাব্‌বা! আমার এক কথা—একেবারে যাকে বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!

*　　　　*　　　　*　　　　*

[স্থান—একটি ব্যবসায়ী অফিস। মালিক পূর্ববঙ্গের লোক। আজ খুব সকাল সকাল অফিসে এসেছেন। কর্মচারীরা ভয়ে তটস্থ। না জানি, কার কাজে কোন ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে!]

মালিক॥ আইজ সকাল সকাল অফিসে আইছি বইল্যা আপনারা বুঝি খুব ভয় পাইচেন? না না—শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই। আপনাগো আইজ একটা সংবাদ জানামু।

১ম কর্মচারী॥ আজ্ঞে বলুন, আমরা ত' অফিসের কাজে জান-প্রাণ দিয়ে খাটছি—

২য় কর্মচারী॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ছুটির পরও ত্ু' ঘণ্টা থেকে এরিয়ার সেরে রাখি—

৩য় কর্মচারী॥ খাতা-পত্রে কোনো খুঁত পাবেন না আমাদের—

৪র্থ কর্মচারী॥ ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে দু'টো খাতা তৈরী করে ফেলেছি, স্যার—

মালিক॥ বেশ! বেশ! আপনাগো কথা শুইন্যা ভারী খুসী হইলাম। অফিসের কাজকর্ম তা আইলে বেশ ভালই চইলতাছে!

বড় বাবু॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। খাতা-পত্রে আপনি কোনো ত্রুটি পাবেন না—! ওরে কে আছিস,—লেজার বইগুলো—

মালিক॥ থাইক থাইক! তা হইলে আমার কথাডা আপনারা শোনেন,—যে জন্য এত সকালে আমি অফিসে চইল্যা আইচি—

বড় বাবু॥ আজ্ঞে বলুন স্যার। ব্যবসাতে খুব লাভ হয়েছে বুঝি?

মালিক॥ না না, খুব যে বেশী লাভ অইচে তা না। তবে কি জানেন, ইষ্টব্যাঙ্গল জিতছে কাইল। আমি ঠিক করছি—সকলেরে এক মাসের পূজা বোনাস দিমু—আপনারা সব ভালো কইর‍্যা মন দিয়্যা কাম কইর‍্যা যান— (প্রস্থান)

বড়বাবু॥ হুঁ! ব্যাটার হাত দিয়ে একটি পয়সা গলে না! একদিন কামাই করলে মাইনে কেটে নেয়···একেবারে দাতাকর্ণ হ'য়ে উঠেছে। ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে তাই হয়েছে কি শুনি?

সবাই॥ আজ্ঞে ঠিকই ত'! তবে বোনাস্‌টা···বুঝলেন না! বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্‌···হা—হা—হা!

* * ৬ * *

[স্থান—অপর একটি অফিস। মালিক পশ্চিমবঙ্গের লোক। মুখ গম্ভীর করে খাস্‌ কামরায় বসে আছেন। এমন সময় একটি বেয়ারা এসে ঢুকলো।]

বেয়ারা॥ আইজ্ঞা কোর্তা—

[কোনো সাড়া নেই]

বেয়ারা॥ কর্তা, আমার পরিবারের বড় ব্যামো—

[কর্তা নীরব]

বেয়ারা॥ আইজ্ঞা কোর্তা—

মালিক॥ আমি কি কালা? কি ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচ্ করছিস—কানের কাছে এসে?

বেয়ারা॥ কোর্তা, আমারে বাঁচান....পরিবারের এখন-তখন অবস্থা! দোহাই কর্তা, আপনের পায়ে ধরি—

মালিক॥ এখন তখন অবস্থা তা আমি কি করবো? আমি কি ধন্বন্তরী? কানে তারক-ব্রহ্ম নাম শোনাতে থাক।

বেয়ারা॥ আইজ্ঞা কোর্তা, আপনি কন কি? ওষুধ-পত্তর ত' খাওয়ান লাইগ্‌বো। বেশী না, আমারে পাঁচডা টাকা দ্যান....

মালিক॥ দ্যাখ, এটা অফিস। দান-খয়রাতির জায়গা নয়। মিছে বিরক্ত করিসনে আমায়--কাজে যা—

বেয়ারা॥ কিন্তু কোর্তা, আমার পরিবার—

মালিক॥ চুলোয় যাক তোর পরিবার! আজ একটি পয়সা কেউ অ্যাড্‌ভান্স পাবে না! আজ আমার মন-মেজাজ ভালো নেই।

বেয়ারা॥ একবার ভাইব্যা দেখেন কর্তা—আমার বিপদডা—

মালিক॥ তোর বিপদ তাতে আমার কি রে? কাল যে আমার অমন বিপদ হোল—কেউ এগিয়ে এলো?

বেয়ারা॥ আইজ্ঞা, আপনার বিপদ কোর্তা?

মালিক॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ! আমার বিপদ! কাল মোহনবাগান হেরে যায়নি! যা যা—আমার সুমুখ থেকে সরে যা, নইলে চাকরী থাকবে না বলে দিচ্ছি!

(স্থান—বালিগঞ্জের একটি অতি আধুনিক হালফ্যাসনের বাড়ী। ঝি চাকর থেকে সুরু করে বাড়ার সবাই তটস্থ। ব্যাপার আর কিছুই নয়। বাড়ীর একমাত্র মেয়েকে বরের বন্ধুরা দেখতে এসেছে।]

১ম বন্ধু॥ বেশ ত'! রবীন্দ্রনাথের গান না জানেন—আধুনিক গান একটা আমাদের শুনিয়ে দিন—

[কনে চুপচাপ]

২য় বন্ধু॥ আমরা হিন্দি গান শুনতেও ভালবাসি—(সুর করে) লারে লাপ্পা—লারে লাপ্পা—

৩য় বন্ধু॥ তুই থাম দেখি। আমরা শুনতে চাই মিস দত্তের গান। আচ্ছা, একটি ভাটিয়ালি গানই ধরুন না—

৪র্থ বন্ধু॥ নিদেন পক্ষে একটা রামপ্রসাদী—

মা আমায় ঘুরাবি কতো—

কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো—

[কনে তবু নীরব রইল]

৫ম বন্ধু॥ আচ্ছা আমরা শুনেছিলাম, মিস দত্ত খুব সোসিয়্যাল।

৬ষ্ঠ বন্ধু॥ আর একথাও জানতে পেরেছি যে, আমাদের ভাগ্যবান বন্ধুটি মিস দত্তের গানই শুনেই নাকি—

গৃহকর্তা॥ আজ্ঞে আপনারা ঠিক কথাই শুনেছেন। অপূর্ব আমার মেয়ের গলা। গীত-সাগরে গান গেয়ে গীত-কুহেলিকা উপাধি পেয়েছে। গাও ত' মা মিনি, একটি আধুনিক গান গেয়ে শুনিয়ে দাও ত'!

কনে॥ না বাবা, আমায় অনুরোধ কোরোনা, আজ আমি কোনো গান গাইতে পারবো না—

১ম বন্ধু॥ টন্‌সিল বেড়েছে বুঝি? তা, আমি ত' ডাক্তার, ভালো ওষুধ 'প্রেস্‌ক্রাইব' করে দেবোখন।

২য় বন্ধু॥ কাল কোনো সভায় আপনার বক্তৃতা ছিল বুঝি?

৩য় বন্ধু॥ তা একটু আদা নুন খেয়ে—

কনে॥ ফর হেভেন্স সেক্‌। আজ আপনারা আমায় রেহাই দিন।

গৃহকর্তা॥ না, না, এত ভাল গাইতে পারো তুমি। ওঁরা কি মনে করেছেন বলো ত'!

কনে॥ (কেঁদে ফেলে) মোহনবাগান গোল খেলো, আর তুমি আমায় গান গাইতে বলছ বাবা। এর চাইতে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে?

[কনে একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল]

* * * *
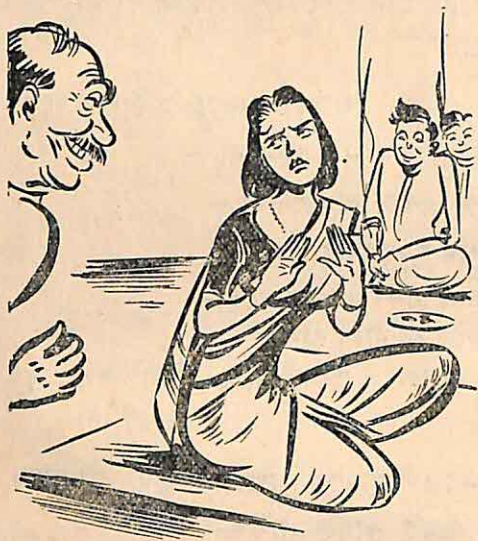
[স্থান—একটি বালিকা বিদ্যালয়। টিফিনের সময় মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে গাছতলায় সমবেত হয়েছে]

মঞ্জুলা॥ চল হেনা, আমরা একসঙ্গে বসে টিফিন খাই—

হেনা॥ কেন, আজ এত আদর শুনি?

মঞ্জুলা॥ আদর আর কি ভাই? মা ঘরে মিষ্টি তৈরী করে দিয়েছে—তোকে না দিয়ে কি আমার খেতে ইচ্ছে করে?

হেনা ॥ থাক অত খাতিরে আর কাজ নেই। ও মিষ্টি আমার কাছে তেতো লাগবে। তোর বাড়ীর মিষ্টি তুই--ই খানা!

মঞ্জুলা ॥ কেন রে হেনা? এ কথা বলছিস কেন? আমি কি দোষ করলাম, কিছু বুঝতে পারছিনে ত'!

হেনা ॥ ইস্! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না যেন!

মঞ্জু ॥ কি বলতে চাস তুই?

হেনা ॥ আমি এই কথাই বলতে চাই যে, ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে বলেই তুই আমায় এত আদর করে মিষ্টি খেতে বলছিস! যা— খাবো না আমি তোর মিষ্টি! বাঙাল কোথাকার…

মঞ্জুলা ॥ হুঁ! আমি ত বাঙাল! কিন্তু তোরা ত' ঘটি…

হেনা ॥ (কোমরে সাড়ি জড়িয়ে) ঘটি! তাতে হয়েছে কি, শুনি! আয় না দেখি—(মঞ্জুলির বেণী টেনে ধরল)

মঞ্জুলা ॥ বটে। আমার সঙ্গে জোরে পারবি তুই? আমি সাঁতরে পদ্মা পার হয়েছি—(ঘুঁষি মারলে হেনার ঠোঁটে)

হেনা ॥ বাঙ্গাল কোথাকার—

মঞ্জুলা ॥ ঘটি কোথাকার—

[দু'জনের চীৎকার শুনে অন্যান্য মেয়েরা ছুটে এলো। তারপর মেয়েরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এ ধরলো ওর বেণী টেনে; ও ধরলো তার আঁচল আঁকড়ে। তারপর কামড়া-কামড়ি, আঁচড়া-আঁচড়ি, চীৎকার, শেষ পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কান্না ·! এতগুলি মেয়ের কান্না শুনে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বেরিয়ে এলেন। তারপর দুই চোখ কপালে তুলে চীৎকার করতে লাগলেন।]

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ॥ এই দারোয়ান, রামসিং, পুলিশ, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, সি-এস-পি-সি-এ…জলদি…

[যবনিকা]

স্বাধীনতা-দিবস আর শ্রীঅরবিন্দ-মহোৎসব একযোগে।
যাকে বলে একেবারে মণি-কাঞ্চন সংযোগ।
গড়ের মাঠে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।
যেমন ছেলে—তেমনি মেয়ে।
ভাগাভাগি করে বিরাট এক তৌলদণ্ডে বসিয়ে দিলে বোধ করি সমানই হবে।

উৎসব ছিল মোহনবাগান-গ্রাউণ্ডে। খেলাধূলা আর ব্যায়ামের কসরৎ।

অনুষ্ঠান যখন চলছিল তখন রাশি রাশি মাথা দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সব স্থির হয়ে বাগানের মতো বেড়া দেয়া অবস্থায় আটকা ছিল।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে যখন উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হল—তখনই বিপদ!

পিল্ পিল্ করে পিঁপড়ের সারির মতো কে যে কোন দিকে বেরিয়ে এলো ঠিক ঠাহর করা গেল না।

লোকের দারুণ চাপে গুণধর বেশ খানিকটা পথ শূন্যে-শূন্যেই যেন উড়ে এলো। তারপর কোনো রকম নোটিশ না দিয়েই একেবারে থপাস্ করে—পপাত ধরণী-তলে—

গুণধর এইবার হৃদয়ঙ্গম করলে যে, নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। পরের কাঁধে খানিকক্ষণ চলে বটে, কিন্তু সেই কাঁধ যখন বদল হয়—তখন দস্তুরমতো জানিয়ে দিয়ে যায় যে, তারা এইবার সরে গেল!

উপায় নেই, মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতেই হবে। কেন না, কবিই সৎপরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন—

"যে মাটিতে পড়ে লোক
ওঠে তাই ধরে!"

উঠে দাঁড়িয়েই ঘাড় ফিরিয়ে পাঞ্জাবীর পেছন দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই।

পাঞ্জাবীর ঠিক পেছনটায় কাদার একটা ছাপ পড়ে গেছে। মাঝখানে খানিকটা ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই জমি ভিজে বেশ মোলায়েম হয়ে আছে, মানে—ছাপ দেবার পক্ষে তৈরী হয়েই আছে, শুধু একটা আধার পেলেই হল।

এর জন্যে মন খারাপ করে লাভ নেই। শরীর থাকলেই ব্যাধি হয়, জামা থাকলেই কাদার দাগ লাগে। এসব ব্যাপারে যে মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না—সে একটি আস্ত নিরেট···

গুণধর চরণ-যুগলকে আরো দ্রুত করলে। লোকভর্তী একটা বাস বেশ গদাই-লস্করী চালে এস্‌প্ল্যানেডে মোড় ঘুরছে। শুধু ভর্তী বল্লে নিছক ভদ্রতা করে বলা হয়। একেবারে যাকে বলে বাদুড়-ঝোলা।

এইজাতীয় প্যাককরা বাস আর ক'টা তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে—আর সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অনাথ বালকের মতো তাকিয়ে থাকবে, সেকথা ঠিক করে বলা শক্ত!

এদিক ওদিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে কুণ্ঠিত একটা ডাক এলো—শুনছেন—

গুণধর প্রথমটা আদপেই আমল দেয় নি—এরকম 'শুন্‌ছেন' ডাক—কত জন কত জনকে ডাক্‌তে পারে—মানে, আহ্বান জানাতে পারে। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে কোনো মেয়ে যে তাকে ডাক্‌তে পারে না—সে বিষয়ে গুণধর একেবারে নিশ্চিন্ত। তাই নিতান্ত কৌতূহলবশেও সে ফিরে তাকায় নি!

কিন্তু না, ডাকটা যে আবার এলো!

ঠিক তার ঘাড়ের কাছে বল্লেও চলে।

এইবার আর কৌতূহল নয়, কর্তব্যবোধে সে ফিরে তাকাল।

হ্যাঁ, একটি সুশ্রী ও সুবেশা তরুণী তাকেই উদ্দেশ করে বল্‌ছে।

তবু ভদ্রতার খাতিরে যে কথা উচ্চারণ করতে হয় গুণধর তাই বল্লে, আপনি আমায় কিছু বল্‌ছেন?

হ্যাঁ—মেয়েটি এগিয়ে এসে জবাব দিলে। আমার ড্রাইভারকে এইখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, সে হয়ত আমার কথা বুঝতে পারে নি, গাড়ী নিয়ে চলে গেছে,···আপনি ত' আমাদের পাড়াতেই থাকেন—

এতক্ষণ গুণধর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল, এইবার সত্যি বিস্মিত হল! এই তরুণীর সঙ্গে একপাড়ায় সে বাস করে—সে খবর তরুণীটির অজানা নয়, অথচ সে এর বিন্দুবিসর্গও জানে না!

এর চাইতে আশ্চর্যের কথা আর কি হতে পারে!

সে শুধু আম্‌তা-আম্‌তা করে ভাঙা-ভাঙা কথায় উত্তর দিলে, আমি—মানে—আপনি—আমাদের পাড়ায় থাকেন?

মেয়েটি ইতিমধ্যে সঙ্কোচের ভাবটা বেশ কাটিয়ে নিতে পেরেছে। বল্লে, হ্যাঁ, আপনার বাসার নম্বর সতেরো আর আর আমার হচ্ছে একুশ। মানে আপনাদের বাসা পেরিয়ে যেতে হয়। আর আপনি পড়েন—স্কটিসে আর আমি উইমেন্স কলেজে। এখানেও রোজ ছাড়িয়ে যেতে হয়।

গুণধরের জন্যে যে ১৫ই আগষ্ট তারিখে এত বিস্ময় জমা হয়ে ছিল—বাড়ী থেকে বেরুবার সময় সে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি। সতেরো—একুশ—স্কটিশ আর উইমেন্স কলেজ! অথচ সে এতদিন কিছু টের পায় নি!

পৃথিবী থেকে চন্দ্র কত লক্ষ কোটি মাইল দূর—তা সে হিসেব করে বলে দিতে পারে; পারে না শুধু তাদের তালপুকুর লেনের সতেরো থেকে একুশ নম্বর বাড়ীটা কতদূর সেই কথা বল্‌তে!

গুণধর তখন ভাব্‌ছে—মেয়েটি তার নামটাও জানে না কি?

নাঃ, সেটা সম্ভবপর নয়।

একট্রামে হয়ত ওরা হামেশা কলেজে যায়—তাই তরুণী ওকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে থাক্‌বে। কিন্তু সচরাচর এই আগ্রহটা ত' উল্টো দিক থেকেই দেখা যায়!

আর বেশীক্ষণ চুপচাপ থাক্‌লে—মেয়েটিও হয়ত যেচে আলাপ করবার জন্যে লজ্জা পেতো। তাই সেই দুর্বল মুহূর্তটিকে সহজ করবার জন্যে গুণধর মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকে মাঝে মাঝে ট্রামে দেখেছি বটে!

এইবার তরুণীটি খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠল। —না, আমি ট্রামে যাই না ত'! বাড়ীর গাড়ী আছে। হেদোর কাছে আপনি প্রায়ই ট্রাম থেকে নামেন কিম্বা ট্রামে ওঠেন—দেখতে পাই।

গুণধর মনে মনে বললে, মা বসুন্ধরা, দ্বিধা হও। কিন্তু এস্‌প্ল্যানেডের পিচ্‌ঢালা রাস্তায় শুধু চারিদিকের আলো পড়ে চিক্‌মিক্‌ করতে লাগ্‌লো, সেখানে ফাটল ধরবার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না!

মেয়েটিই তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করল। বললে, আপনি এখন বাসাতেই ফিরবেন ত'? আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই। মানে, একা একা ট্রামে-বাসে ওঠবার অভ্যেস নেই

ত'! আর মুস্কিল হয়েছে এমন যে, বাড়ীর গাড়ীতে ফিরব বলে 'পার্স'টাও ভুল করে বাড়ীতে ফেলে এসেছি!

গুণধরের মনে-প্রাণে হঠাৎ 'নাইটের' বীরত্ব জেগে উঠ্‌ল। অসহায়া তরুণী, সঙ্গীহীনা—আশ্রয় চাইছে। মধ্য যুগের ইউরোপ হলে এই জন্যে যে কোন 'নাইট' অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বস্‌ত! আর সে কিনা একটা ট্যাক্সির ভাড়া জোটাতে পারবে না! এর চাইতে জীবন না থাকাই উচিত।

গুণধরের বুক-পকেটে কর্‌করে দশটাকার একটি নোট তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। এই নোটটি সে লাভ করেছে একটি পাতায় 'নারী জাগরণ' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে। সম্পাদকের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি ছিল যে, লেখাটি প্রকাশিত হবে একজন শ্রীমতীর নামে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে পাবে নগদ দশটি মুদ্রা।

সেই দশটি মুদ্রা আজ সম্পাদক-বন্ধু তাকে উপঢৌকন দিয়েছেন।

নব-পরিচিতা, সুদর্শনা, তরুণী প্রতিবেশিনীর জন্যে যদি সে এই স্বাধীনতা লাভের সন্ধ্যায় একটি ট্যাক্সি ভাড়া করবার মনের বল নিজের মধ্যে খুঁজে না পায় তবে স্বাধীনতা পেয়ে তার লাভ হল কি? তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন ত' ট্রামে-বাসে ভীড় ঠেলে উঠ্‌তেই হবে।

নাঃ, অন্তত একটি সন্ধ্যা সে স্বাধীনতার বিমল আনন্দ উপভোগ করবে।

ভীড় ঠেলে একটি খালি ট্যাক্সি মন্থর গতিতে এগিয়ে আস্‌ছিল। হিট্‌লার যে ভঙ্গীতে আঙুল নাচিয়ে জনগণকে সম্বোধন করতেন ঠিক সেই কায়দায় গুণধর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আহ্বান করলে, তারপর

স্মিতহাস্যে তরুণী প্রতিবেশিনীকে বল্লে, আসুন, আমি বাসায়ই ফিরছি। আপনাকে কি বলে ডাক্‌বো? মিস—

খুলে পড়া খোঁপাটাকে বাঁ হাতে সাম্‌লে নিয়ে প্রতিবেশিনী উত্তর করলো, আমার নাম লতিকা সোম। কিন্তু আপনি মিছিমিছি আমার জন্যে হুট্‌ করে ট্যাক্সি ডেকে বসলেন··· ? এ জান্‌লে আমি আদপেই আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে অনুরোধ করতাম না গুণধরবাবু—

—আপনি আমার নামও জানেন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো গুণধর! তার দেহে আর মনে অপূর্ব একটি শিহরণ!

হয়ত স্বাধীনতার মৃদু সমীরণের মন্থর প্রভাবই এর একমাত্র কারণ।

জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন মানুষ ভাবে—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

ট্যাক্সীতে বসে গুণধরের সেই অবস্থাই হ'ল। পার্শ্বে নবপরিচিতা সুন্দরী প্রতিবেশিনী, হাওয়ায় তার অলক-দুল্‌ছে, কেশ-বেশ থেকে আসছে একটি অনাঘ্রাত মিষ্টি গন্ধ। অত্যধিক লোকের ভীড়ে লতিকার মুখে জমেছে রাশি রাশি মুক্তা-বিন্দু! তাকিয়ে দেখবার মতো। কিন্তু প্রাণ ভরে গুণধর সেই সৌন্দর্য অবলোকন করবে সে উপায় নেই! ট্যাক্‌সী-মিটার কানে ধরে তার চোখ দুটি ক্রমাগত সেই দিকে আকর্ষণ করছে!

স্বপ্ন আর বাস্তবের এমন সঙ্ঘর্ষের কাহিনী গোর্কীও বুঝি তাঁর অমর-সাহিত্যে অক্ষয় করে রেখে যেতে পারেন নি!

ফলে গুণধরও ট্যাক্‌সীর গহ্বরে বসে ঘেমে উঠল, তার জিভ

গেল আড়ষ্ট হয়ে ; অনেক ভালো ভালো কথা বুকে জমে থাকলেও মুখ দিয়ে বেরুতে চাইলো না।

কিন্তু কথার খৈ ফুটতে থাকলো লতিকার মুখে। সে "তৃষাতুর" কাগজে গুণধরের লেখা প্রায়ই পড়ে, তা ছাড়া, পাড়ার নামকরা ছাত্র হিসাবে চেনে অনেক কাল, শুধু সাম্‌নাসাম্‌নি আলাপ নেই—এই যা ! ইতিমধ্যে লতিকা তাকে চায়ের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করে বসল।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, গুণধরের পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই ! একটানা লতিকা আর কতক্ষণ বকে যেতে পারে ?

বৈঠকী গান তখনই জমে—যখন 'ঠেকা' হয় মনের মতো। লতিকা গুণধরের পক্ষ থেকে কোনো রকম লাগসই 'ঠেকা' না পেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, আপনার বুঝি অন্য কোথাও যাবার কথা ছিল ? আমার জন্যেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল ? ছি-ছি—আমার অনুরোধ করাই অন্যায় হয়েছে !

তখন ভদ্রতার খাতিরেও গুণধরের মৃদু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু দৃষ্টি তখন তার মিটারের দিকে নিবদ্ধ ! তাই ঘাড় না ফিরিয়েই অন্যমনস্কভাবে বল্লে, 'উ—হুঁ !

জবাব শুনে লতিকা যেন সপ্তম স্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলো।

এর প্রত্যুত্তর দিলে লতিকা বাড়ীতে পৌছে।

মিটারে উঠেছিল তিন টাকা আট আনা। গুণধর অবিশ্যি বুক-পকেটের নোটটি ভাঙ্গিয়ে অনেক কষ্টে ট্যাক্‌সী-ড্রাইভারের ঋণ শোধ করলে। কিন্তু লতিকা বলে উঠল, পালাবেন না যেন গুণধর বাবু! আপনাকে চা খেয়ে যেতে হবে।

গুণধর মনে মনে ভাবলে, তিন টাকা আট আনা পকেট থেকে খসল, চা-টা খেয়ে যতটা উশুল করা যায়! তাই আর সে বিশেষ আপত্তি জানালো না। উপরন্তু গড়ের মাঠের 'ধকলে' ক্ষিদেটাও জমে উঠেছিল ভালো ভাবে।

সে শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো লতিকার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে গেল। সেখানে লতিকার বাবার কাছ থেকে পেল প্রচুর অভ্যর্থনা, লতিকার ভাই ঝণ্টু এরোপ্লেন তৈরীর কল-কৌশল হু'মিনিটের মধ্যে ওকে বুঝিয়ে দিলে। লতিকার ছোট বোন গীতিকা গান শুনিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালে এবং লতিকার মা নেপথ্য থেকে লুচি, বেগুনভাজা আর আলুর দম পাঠিয়ে গুণধরের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করলে। লতিকা নিজে এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ইতিমধ্যে সে দিব্যি নিজের বেশ পরিবর্তন করে নিয়েছে! তার চেহারাটা দেখে কে বল্‌বে খানিকক্ষণ আগেই গড়ের মাঠের বিপুল জনতার মাঝখানে সে সঙ্গীহীন ভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। লতিকার নিজের হাতের তৈরী বলে কি-না বোঝা গেল না, তবে গুণধর চোখ বুজে বেশ আমেজ করে চা-টা পান করলে।

তারপর হঠাৎ তাকিয়ে বললে, অনেকক্ষণ আপনাদের বিরক্ত করলাম, আজ তা হলে আসি—

এইবার লতিকার প্রত্যুত্তরের পালা। সে গুণধরের পকেটে তিনটি টাকা আর একটি আধুলি ফেলে দিয়ে বল্লে, এইবার বাড়ী গিয়ে বই খুলে বসুন, কিন্তু মাঝে মাঝে এদিকে পা বাড়াতে ভুলবেন না যেন!

লতিকা যে এমন মোলায়েম ভাবে তাকে চাবুক মারবে একথা

আগে জানা থাকলে গুণধর নিশ্চয়ই ট্যাক্সীর ভেতর তার দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ পেত এবং অমন নির্লজ্জের মতো ঘন ঘন মিটারের দিকেও তাকে তাকাতে হত না!

ল্যাজ-গুটোনো কুকুরের মতো এক পা দু'পা করে সে নিজের বাসার দিকে পা চালিয়ে দিলে, ভদ্রতাসম্মত ভাবে বিদায় গ্রহণ করা পর্যন্ত তার হল না।

বাসায় ফিরে অপমানের প্রতিশোধ নিলে সে তার বালক ভৃত্যের ওপর। সে যে সারাটা দিন ফাঁকি দিয়েছে এই কথাটাই অনর্গল বাক্যস্রোতে সে প্রমাণ করে দিলে এবং তারপর ঘোষণা করলে যে, রাত্তিরে সে কিছুই খাবে না।

যে লেখাটি অবলম্বন করে তার দশটি টাকা প্রাপ্তি ঘটেছিল তার ওপরও গুণধরের আক্রোশ বড়ো কম হয়নি। শ্রীমতী বসুন্ধরা মিত্রের নামে লেখাটি মুদ্রিত হয়েছে। কে জানে এই বসুন্ধরা কোন জগতের মানুষ? তার অস্তিত্ব আছে কি না তাই বা কে বলতে পারে। লেখাটি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সে দোতলার জানালা গলিয়ে উড়িয়ে দিলে।

তারই কয়েকটি ছেঁড়া কাগজ লতিকার পড়ার টেবিলে উড়ে গিয়ে হাজির হল।

কিন্তু লতিকা সম্মার্জনীর আঘাতে আবার সেগুলিকে নীচে রাস্তায় ফেলে দিলে, মুহূর্তের তরে জানতেও পারল না যে, এগুলি তার নবপরিচিত গুণধরবাবুর কলমের ডগায় সৃষ্ট হয়েছে! জান্‌তে পারলে সেই ছিন্নপত্রগুলি শ্রীমতী অঞ্চলে বেঁধে রাখত কি না কে জানে!

এর পর ঘটনা একেবারে মন্থর হয়ে এসেছিল। কেন না, লতিকা কলেজে যায় নিজেদের বাড়ীর গাড়ীতে, আর গুণধর যায় ট্রামে। পরস্পর ইতিমধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

সেদিন হঠাৎ কি একটা বিরাট মিছিলের জন্যে সমস্ত ট্রাম বাস বন্ধ। অথচ একাটা জরুরী ক্লাশ আছে সকালের দিকে। গুণধর হতাশ হয়ে একটি রিক্সার সঙ্গে দর-দস্তুর করছিল, এমন সময় পেছনে হর্ণ শুনে সে থম্‌কে দাঁড়ালো।

লতিকা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লে, আর দর করতে হবে না, আসুন, আমি আপনাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

গুণধর একবার ভাবলে, লতিকা যেভাবে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে তাকে অপমান করেছে তারপর সে ওর সঙ্গে আর কথাই বল্‌বে না।

কিন্তু মুস্কিল বাঁধলো যে, একটি সুশ্রী মেয়ে গাড়ীর দরজা খুলে ডাকাডাকি করছে—এই দৃশ্য দেখেই রাস্তায় লোক জমতে সুরু হয়েছিল। এর পর সে যদি মান-অভিমানের পালা গেয়ে একটা দৃশ্যের অবতারণা করে তবে আর কেলেঙ্কারীর অবধি থাকবে না। তাই সে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য না করে গাড়ীর ভেতর উঠে বসল।

লতিকা আড় চোখে তাকিয়ে বল্লে, আমাদের বাড়ী আর গেলেন না যে বড়ো? পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অসহযোগ সুরু করলেন নাকি?

গুণধর আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিলে, না—মানে সময় পাইনে কিনা! কয়েকটি লেখা নিয়েও ব্যস্ত ছিলাম—

লতিকা যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেল। বল্লে, ভালো কথা,

আপনি ত' একজন উদীয়মান লেখক, আর আমি বাঙ্গলায় পাশ নম্বর একবারও রাখতে পারি নে! আপনি আমায় বাঙ্গলাটা ভালো করে শিখিয়ে দিন। সময় নেই বলে পাশ কাটিয়ে গেলে চল্‌বে না কিন্তু।

কথায় বলে, পাগ্‌লা খাবি? না আঁচাবো কোথায়?

গুণধর যেন এই রকম একটি অনুরোধের আশাই করছিল; কাজেই তার দিক থেকে রাজি হতে আর বেশী বিলম্ব হ'ল না!

এর পর থেকে গল্পের গতি যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চল্লো তাকে একমাত্র হিন্দি সিনেমার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

নায়ক আর নায়িকার যদি পরিচয় ঘটে গেল তবে গল্প বুনো মোষের মতো সামনে এগিয়ে যাবে না কেন? আশে-পাশের কারো দিকে তাকাবার অবকাশ তখন আর থাকে না! চলন্ত ট্রেণের মধ্যে বসে থাকলে টেলিগ্রাফের তারের ওপর বসা ফিঙে পাখিটি যেমন প্রবল বেগে কাছে এসে অধিকতর দ্রুত বেগে বহু দূর চলে যায়, তেমনি নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে গল্প যেন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে আশী মাইল বেগে উড়ে চল্লো।

নায়ক গরীব হতে পারে, কিন্তু নায়িকার আছে নিজস্ব বাড়ী। সে ক্ষেত্রেও যদি গল্প না এগোয়, তবে গল্প লেখকের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

লতিকার নব-নব পরিকল্পনায় ওরা দু'জনে আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে, কাল বেলুড়ে, পরশুদিন মেট্রোতে ঘূর্ণির বেগে ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর কলেজ, পড়া, রুটিন, এগ্‌জামিন প্রভৃতি তাদের সঙ্গে সমানে তাল রাখতে না পেরে হাঁপিয়ে ক্রমশ তাদের দু'জনার দৃষ্টি থেকে পেছিয়ে পড়তে লাগলো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে সেদিন অঢেল চাঁদের আলো।

গুণধর বল্লে, লতু, তোমার বোনের মুখে শুনতে পাই তোমার কাছেই সে সব গান শিখেছে। কিন্তু তুমি আমায় গান শোনাতে চাও না কেন শুনি?

লতিকা মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিলে, আগে খুব গাইতাম, কিন্তু দু' বছর হয় একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। সত্যি বলছি, গলা ছেড়ে গাইতে আর পারি নে।

গুণধর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, অসুবিধাটা কি? টন্‌সিল? চলো, কালই তোমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। যে রোগটি তোমার মধু-কণ্ঠের পথ আগলে রেখেছে তাকে আমার সতীন বলে সন্দেহ হচ্ছে। ওকে তুমি পুষে রাখতে পারো, কিন্তু আমি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাই।

লতিকা কোনো জবাব দিল না, শুধু ম্লান হাসি হাস্‌লে।

আর একদিন বালি ব্রিজের ওপর। গুণধর মিনতি করে লতিকার দুটি হাত ধরে বল্লে, লক্ষ্মীটি! এখানে কেউ কোথায়ও নেই। আচ্ছা, গলা ছেড়ে না গাইতে চাও গুণ্ গুণ্ করে গাইতে তোমার আপত্তি কি থাক্‌তে পারে?

লতিকা শুধু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে, সত্যি, অনুরোধ কোরো না! আমি বড্ড লজ্জা পাই। আমার উপায় নেই—তাই গাইতে পারিনে! নইলে আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে থাকে তোমায় গান শোনাবো বলে! কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, গাইতে তুমি আমায় বোলো না!

এর পর আর কোনো কথা চলে না, তাই গুণধর অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষা নিয়ে চুপ করে যায়!

একদিন গুণধর বল্লে, তোমার বাড়ীতে গেলেই রাশি রাশি খাবার এনে আমায় খেতে দাও। কিন্তু একদিনও আমি তোমায় কিছু খাওয়াতে পারলাম না। আমার বুঝি ইচ্ছে করে না? আজ তোমার কোনো ওজর-আপত্তি শুন্‌বো না। ফিরপোতে আমি অর্ডার দিয়েই রেখেছি। পোলাও, মাংস আর পুডিং …। তোমার ড্রাইভারকে সেইখানে গাড়ী নিয়ে যেতে বলো।

লতিকা শুধু ওর হাতটায় চাপ দিয়ে বল্লে, শোনো গুণ, এত ব্যস্ত হতে নেই, আমি কোথাও খাইনে। তুমি আমায় ক্ষমা করো—

গুণধর বিরক্ত হয়ে শুধোয়, এ যুগের মেয়ে তুমি, তোমার হোটেলে যেতে এত আপত্তি কেন?

লতিকা বলে, প্রশ্ন কোরো না, আমি তার জবাব দিতে পারবো না। যাবার হ'লে আমি তোমার সঙ্গেই যেতাম—আর কারো সঙ্গে নয়, একথা তুমি সহজভাবেই বিশ্বাস করো গুণ!

গুণধর মনে চটে! হিসেব করে দেখে, ফিরপোর বিল বাবদ বেশ কিছু টাকা মেটাতে হবে, কিন্তু লতিকার একগুঁয়েমীতে কিছুই আস্বাদন করা গেল না!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা লতিকার বাবার নিজস্ব বস্‌বার ঘরে একান্তভাবে গুণধরের ডাক পড়ল।

গুণধর ভাবলে, ব্যাপারটা কি? বুড়ো তার মেয়ের সঙ্গে এত বেশী মেলামেশা পছন্দ কর্‌ছে না বোধ হয়!

যদি শক্ত কথা কিছু বুড়ো বলে, কিম্বা তেমন কিছু মেজাজ দেখায় তবে সোজাসুজি নমস্কার জানিয়ে একেবারে অ্যাবাউট্ টার্ণ করবে, আর এ বাড়ীমুখো হবে না।

কিন্তু এখানেও গুণধরের জন্যে অনেক বিস্ময় জমা হয়ে ছিল। লতিকার বাবা বল্লেন, দেখ বাবা, লতুর মা বলছিলেন, তোমায় নাকি তিনি জামাই কর্তে চান্, লতুরও নাকি এ ব্যাপারে মত আছে। বুঝতেই পারছ বাবাজি, আমি আবার তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারি নে। লতুর মা আর লতুকে তাই আগেই সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ইয়ংম্যান, তোমার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘরোয়া কথা আছে।

এতখানি সৌভাগ্যের জন্য গুণধর সত্যি প্রস্তুত ছিল না। নিভৃত রাত্রের স্বপ্নে যাকে কামনা করা যায় সে যদি বাস্তবের মাঝে এসে ধরা দেয়, তবে আনন্দ রাখবার আর ঠাঁই থাকে না!

প্রথমটা তার মুখ দিয়ে এ সম্পর্কে কোন কথাই বের হ'ল না!

কিন্তু লতিকার বাবা কারো কথার জন্যে অপেক্ষা করবার লোক নন। তাঁর বক্তব্য তিনি বলেই চলেছেন: দেখ বাবাজি, আমার মেয়েকে যদি তুমি বিয়ে করো, তবে আমি তোমায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবো, সে সম্পর্কে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। সারা জীবনে কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো জমিয়েছি। ছেলেদের জন্যে বেশ কিছু রেখে যেতে পারবো বলেই আশা করি। আমার লতুর বরকে বিলেত ঘুরিয়ে আন্বো--এই আমার বহুদিনের সঙ্কল্প। তুমি লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়তে যেতে রাজি আছ ত'? অবশ্যি আমি মেয়ের কাছে শুনেছি যে, তুমি সাহিত্য-চর্চা করো।

তা ব্যারিষ্টার হলেও সাহিত্যচর্চায় কোনো বিঘ্ন হবে না। তোমাদের প্রভাত মুখুজ্জেও ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি আবার নামকরা গল্প-লিখিয়েও ছিলেন।

যে লোকটি আদপেই খেতে পায় না—তার সাম্‌নে রাজভোগ সাজিয়ে দিয়ে যদি বলা যায় যে, কিছুই আয়োজন করা সম্ভব হয় নি—সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটির মনের অবস্থা সে সময় যেমন্ হয়—আমাদের গুণধরের অবস্থাও তদ্রূপ হয়ে উঠল!

যাকে বলে একসঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে! গুণধর কী বা বলবে, আর কেমন করেই বা ধন্যবাদ প্রদান করবে ভাবী প্রেয়সীর পিতৃদেবকে।

কাজেই কোনো কিছুই করা সম্ভবপর হল না তার দ্বারা! সে শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেল। লতিকার বাবা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, ওই বুঝি লতুর মা ফিরে এলেন। তা বাবা, আমার প্রস্তাবে তোমার কোনো আপত্তি নেই ত'?

এইবার গুণধর নিজেকে কোনো রকমে আত্মস্থ করে লতিকার বাবার পায়ের ধূলো নিয়ে জবাব দিলে, এ ত' আমার সৌভাগ্য।

সেদিন বাসায় ফিরে আসবার মুখে গুণধর লতিকার কানে কানে বলে এলো, কাল সন্ধ্যেবেলা বাসায় থেকো, দু'জনে একলাটি বেড়াতে বেরুবো। অনেক দূর যাবো—অনেক কথা বলব। আর গান শুনবো তোমার।

লতিকা একটি আনন্দোজ্জ্বল বিলোল কটাক্ষে সম্মতিজ্ঞাপন করলে।

পরদিন বিকেলের একটু পরেই ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে

একটি গাড়ী দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। আজ লতিকা নিজের হাতে গাড়ী ড্রাইভ করছে, ড্রাইভারকে সঙ্গে আনে নি; কি জানি গুণধর আনন্দের আতিশয্যে কখন কি করে বসে। অথবা লতিকার মনেই কোনো গোপন কামনা আছে কি না কে জানে!

নারীর মনের হদিশ দেবতারা অবধি জানেন না, গুণধর ত' কোন্ ছার!

গাড়ী যখন এক নির্জন মাঠের ধারে পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে!

গুণধর বল্লে, লতু, চলো আজ আমরা দুটিতে এই নির্জন মাঠের অন্ধকারে আত্মগোপন করে মনের কথার হরির-লুট ছড়াই···

লতু রসিকতা করে জবাব দিলে, মাঠে গিয়ে বসতে চাইছ চলো, কিন্তু অন্ধকারে আত্মগোপন করা মোটেই চলবে না। বাঁশ গাছের পাশ দিয়ে দেখছ ত' চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। আজ পূর্ণিমা।

গুণধরের মনেও যেন হঠাৎ জোয়ার ডেকে উঠল। বল্লে, বেশ ত', পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবনে আমরা পুরোপুরি মন দেয়া-নেয়া করি। কারো মনে কোনো কথা আমরা কেউ লুকিয়ে রাখবো না। তোমার কথা আমি জান্‌বো, আমার কথা শুন্‌বে তুমি।

লতিকা মাথা দুলিয়ে বল্লে, বেশ, তাই হবে।

গুণধর আজ মুখর হয়ে উঠেছে। বল্লে, আজ কিন্তু তোমায় গান শোনাতে হবে! কোনো আপত্তি আর শুন্‌ছিনে আমি।

লতিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘাসের গালিচার ওপর আরাম করে বস্‌ল গুণধর। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল একটি তাকিয়া পেলে এই জ্যোৎস্না-ধৌত সন্ধ্যায় আবেশটি জমত ভালো।

—একটি আধুনিক প্রেমের গান ধরো—মানে সিনেমার গান। ফরমাস দিলে গুণধর।

লতিকা বল্লে, গান ত' আমি গাইতে পারি নে !

—আচ্ছা, লতু, সবটাতেই তোমার আপত্তি কেন বল ত? আমি গান গাইতে বল্লে তুমি গাইবে না, খেতে বল্লে খাবে না ! আমার মনে কি কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই? গুণধর অভিযোগ তোলে।

মধুর কণ্ঠে লতিকা জবাব দিলে, আচ্ছা, এইবার থেকে তুমি কিছু খেতে চাইলে কিম্বা আমায় খেতে দিলে আমি না করবো না।

লতিকার মনে অনেক আশা। সে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

কিন্তু কথা-শিল্পী গুণধর তার ধারে-কাছেও গেল না। উৎসাহিত হয়ে উঠে বল্লে, 'নভেল আইডিয়া' আমার মাথায় এসেছে। এই চীনে-বাদামওলা, শীগ্গীর এই দিকে আয়। এসো লতু, আজ আমরা নির্জনে বসে চীনে-বাদাম খাই—

রাশীকৃত চীনাবাদাম কোঁচায় জড় করে হাসিমুখে সে লতিকার দিকে তাকালো।

লতিকার মুখের প্রদীপ নিভে গিয়ে যে ম্লান হয়ে এসেছে সেদিকে গুণধরের দৃষ্টি নেই। বল্লে, নাও ধরো, 'দশন-মুকুতাপাতি' না হয় আমায় দেখালেই—

সত্যি লতিকার মুক্তোর মতো দাঁত গুণধরের এক পরম বিস্ময়। চাঁদের আলোতে দাঁতগুলি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি চীনাবাদাম তুলে নিয়ে লতিকা প্রবল কামড় দেয়।

কিন্তু পর মুহূর্তেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। লতিকার মুখ থেকে ছিট্‌কে খুলে বেরিয়ে এলো দু'পাটি বাঁধানো দাঁত ঠিক গুণধরের সাম্‌নে-কার ঘাসের আস্ত-রণের ওপরে! চাঁদের আলোয় দাঁতগুলি বীভৎসভাবে চিক্‌চিক্ করে উঠ্‌ল। লজ্জায় বিশীর্ণ হয়ে লতিকা আর্তনাদ করে উঠ্‌ল। আঁৎকে উঠে গুণধর পেছু হটে গেল!
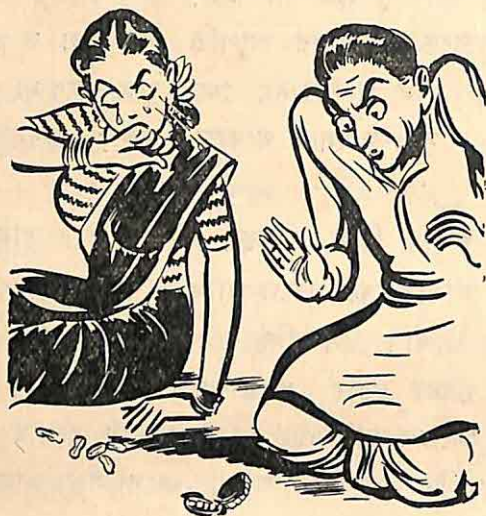
তার পর থেকে আর কোনো কথা-শিল্পী বা জীবন-শিল্পী এ কাহিনীর সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি করতে এগিয়ে আসেন নি!

পূর্ব বঙ্গের নদীবহুল অঞ্চল দিয়ে একদিন সন্ধ্যায় একটি ষ্টীমার যাত্রী-ভর্তি হয়ে চলছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই ষ্টীমারটিতে একটি ঘরোয়া বৈঠক বসে। বৈঠকের সভ্যবৃন্দ হিন্দু আর মুসলমান দুইই আছেন। এই জাতীয় ছোট ষ্টীমারে সারেঙই সর্বেসর্বা।

শাহানশা বাদশার মতো তাকে মান্যি-গন্যি করে চলে তার অনুগত জন। কেননা সারেঙের কথার ওপর আর কোন আপিল নেই এ কথা ষ্টীমারের কর্মচারীগণ সবাই জানে।

বস্তুতঃ কোম্পানীর কাছ থেকে ইজারা নিয়ে সারেঙই সারা বছর কাজ চালায়···সেই জন্য ষ্টীমারের কাজে 'বহাল' আর 'বরখাস্ত' সব সারেঙের মন-মেজাজের ওপর নির্ভর করে।

অনুগত এক খালাসী সারেঙের হাতে ফর্সী হুঁকো তুলে দিলে। সারেঙ মুদ্রিত নয়নে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টেনে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

ষ্টীমারের ভেতরকার চা-খাবারের দোকানের ইজারদার গোবিন্দ মোদক জিব আর তালুতে একটা বিক্ষোভের ধ্বনি তুলে বল্লে, যা দিন কাল পড়েছে সারেঙ সাহেব, তাতে উপরি-পাওনা আমাদের একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। যা হোক একটা বুদ্ধি বাৎলাও মিঞা সাব!

চোখ না খুলে একটা গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে সারেঙ বল্লে, জলের ওপর আর উপরি পাওনা কি হবে? আগে বড় বড় লোকেরা এই লাইনে যাতায়াত করত'···সারা বছরে সকলেরই বক্শীস্টা ভালই পাওনা ছিল। এখন এই মগের মুল্লুকে কে আসবে শুনি?

গোবিন্দ মোদক জবাব দিলে, ওদিকে কলকাতায় কথায় কথায় কালো-টাকার থলি খুলে দিচ্ছে লোক। আমরা কি পেট শুকিয়ে থাক্বো সারেঙ্ ভাই?

বাট্‌লার গণি মিঞা এতক্ষণ চুপচাপ বসে কথা শুন্‌ছিলো। ফোঁস করে উঠে ফোঁড়ন দিলে, মুর্গী রেঁধে আর মনে সুখ পাই না,

হিন্দুরা সব চলে গেল বিদেশে। দেশে যাতায়াতের পথে ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা কি তারিফ্ই না করত আমার রসুইয়ের। বেনুনে আর সে বাস্না নাই। বকশীস ত' উঠেই গেছে কর্তা।

টিকিট ক্লার্ক নটবর ভাণ্ডারী রাগের মাথায় খানিকটা সিক্নি ফেলে দিয়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, ঠিক কথা বলেছ গণি মিঞা। থার্ড ক্লাসের টিকিট করে উঠে ভীড়ের চাপে বাবুরা ফাষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে যাবে, তবে না আমার উপরি পাওনার রাস্তা খুলে যায়। থার্ড ক্লাসের টিকিট 'পাঞ্চ' করে-করে হাতে ব্যথা ধরে গেল! সত্যি মিঞা ভাই, মনে আর সুখ নেই। সামনে জামাই ষষ্ঠী; উপরি পাওনা না হলে জামাই বাড়ী দেবো-থেবো কি?

সারেঙ্ মৃদুহাস্যে জবাব দিলে, হুঁ! বুঝলাম ত' সবাই। কিন্তু আমি কি করবো কও— ?

আল্লাবক্স জমাদার অতি বিনয়ে ঘাড় কাৎ করে বল্লে, এই পাণির মধ্যেও একটা পথ খোলা আছে হুজুর—

খাবারের দোকানের গোবিন্দ মোদক বিশেষ উৎসাহিত হয়ে বল্লে, কি পথ বলত' জমাদার—না হয় আমরা সবাই মিলে—

জমাদার আবার হাত দুটো কচ্লে বল্লে, হুজুর হুকুম করলে—বল্তে সাহস পাই—

নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে সারেঙ্ বল্লে, কও শুনি—

জমাদার চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে কইলে অনেক আমের ঝুড়ি চালান যাচ্ছে হুজুর—

মাথা নেড়ে সারেঙ্ বল্লে, ওতে সুবিধে হবে না—অন্য পথ বাৎলাও—

গোবিন্দ মোদক এইবার যেন অন্ধকার পথে চেরাগ খুঁজে পেলো। বল্লে, সারেঙ্ সাহেব, হদিশ মিলে গেছে—এখন সব তোমার ওপর ভরসা—

গণি মিঞা অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিলে, আরে কওনা বাবু, আমার আবার মুরগী ছাড়াতে হবে। ডাঁটা আর কাঁঠাল বিচি খেয়ে মুখ পচে গেছে।

গোবিন্দ মোদকের মুখে-চোখে একটা আবিষ্কারের উল্লাস। সারেঙের কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে, ষ্টীমারটা আজ রাত্রে নদীর চরে আটকে দাও না—সারেঙ সাহেব—

সারেঙ এইবার চোখ খুল্লে। শুধোলে, তা হলে কি সুবিধেটে হবে শুনি ?

গোবিন্দ মোদক বল্লে, আলবাৎ সুবিধে হবে সারেঙ্ ভাই। চিড়ে আর মুড়ির দাম—চড়্ চড়্ করে টাকায় উঠে যাবে। খাবার গুলো দুনো দামে বিক্রী করতে পারবো—

বাটলার গণি মিঞার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে হাঁ, কর্তা। তা হলে আমি গোটা কয়েক মুর্গী জবেহ করতে পারি। পেটের ক্ষিদেয় প্যাসেঞ্জাররা সোনা মুখ করে চার চারগুণ দাম দিয়ে কিন্‌বে।

জমাদার বল্লে, সামনের ইষ্টিশনের চর থেকে আমি তা হলে কিছু দুধ কিনে ফেলি। চড়া দরে চালিয়ে দেবো।

টিকিট ক্লার্ক একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, রাত্রে ঘুমোবার

জন্যে তাহলে বাবুদের ফাষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারতেই হবে। বেশ কিছু কাঁচা পয়সা হাতিয়ে নিতে পারি।

সারেঙ বাবাজী এতক্ষণ চুপচাপ কথাগুলি গিল্‌ছিল আর গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল, ভুরুটা কুঁচকে বল্লে, সবই ত' বোঝলাম। কিন্তু আমার তাতে লাভ ?

গোবিন্দ মোদক উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, লাভ ? তোমার বখ্‌রা থাক্‌বে সারেঙ সাহেব। শুভ কাজে আর আপত্তি কোরো না। এই মা গঙ্গার ওপর দাঁড়িয়ে বল্‌ছি, মোটা বখরা দেবো তোমায়।

সারেঙ তবু চোখ খোলে না।

গণি মিঞা, গোবিন্দ মোদক, নটবর ভাণ্ডারী, জমাদার আল্লাবক্স সবাই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

আরো খানিকটা ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে দিয়ে সারেঙ কথা কইলে বল্লে, আধাআধি বখরা আমার। রাজী থাকো ত' কথা কও গোবিন্দ বাবু—। একটু আঁধার না হলে চরে ইষ্টিমার আটকানো যাবে না।
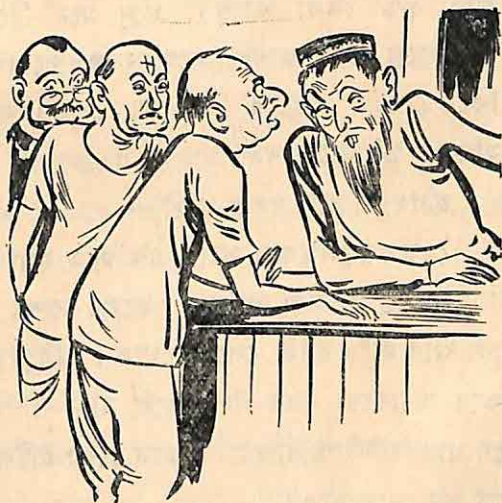
গণি মিঞা, নটবর, আল্লাবক্স সবাই গোবিন্দ মোদকের শ্রী মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

অর্থাৎ রাজী হয়ে যাও দাদা,—আমরা ত' সব দিক দিয়ে পুষিয়েই দেবো—

খালাসীরাও ইতিমধ্যে কেউ কেউ দু একবার উঁকি মেরে গেছে। ঘটনার কদ্দুর এগুলো তারাও জানতে চায়—

সারেঙ তাদের একজনকে ধমক দিয়ে বলে, এই, তুই এখানে কি শুনছিস? যা—ইষ্টিমারে চেরাগ জ্বালিয়ে দি গে যা—

খালাসীটা থতমত খেয়ে চলে গেল।

গোবিন্দ মোদক তখনো ইতস্তত করছিল। অনেকগুলি চিড়ে আর গুড় কেনা আছে। মনে মনে হিসেব করে দেখল, ষ্টীমার আটকালে প্যাসেঞ্জাররা সঙ্গে সঙ্গে দুনো কিম্বা চারগুণ দরে মাল কিনে নেবে। পেটের খিদে বড় সোজা কথা নয়। সঙ্গে কাচ্চা বাচ্চাও ত' আছে।

হঠাৎ সে বলে বসল, রাজী—

বৈঠকের লোকেরা সবাই এক সঙ্গে হল্লা করে উঠল।

সারেঙ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জলের ওপর কাজ করে করে তার চুল আর দাড়ি দুইই পেকে গেছে। নিজের মনের আনন্দ গোপন করে সবাইকে ধমক দিয়ে বল্লে, না—না এখানে আর হল্লা নয়—যে যার ডিউটিতে যাও। সাম্‌নে চরের ইষ্টিশান যার যা কেনা কাটা চট্ পট্ সেরে নাও।

হাসি মুখে সবাই উদ্যোগ পর্বের জন্য চলে গেল। ইষ্টিমারের

'চেরাগকে' সাক্ষী রেখে হিন্দু-মুসলমানের অলিখিত প্যাক্ট বিনা রক্তপাতে সমাধা হয়ে গেল।

এইবার যাত্রী দলে ফিরে আসা যাক্।

চরের ষ্টেশন ছেড়ে গেছে।

সন্ধ্যে আরো খানিকটা ঘনিয়ে এসেছে।

হিন্দু যাত্রীদের মধ্যে যারা তীর্থ-যাত্রী তারা এক যায়গায় জটলা করে এক বুড়ো বামুনের কাছে রামায়ণ শুনছে।

মুসলমান যাত্রীদের মধ্যে বয়স্ক কেউ কেউ সামনে ডেকের ওপর গিয়ে চাদর বিছিয়ে নামাজ পড়ছে। শিক্ষিত একজন মুসলমান কোরাণ পাঠ করছে আর একদল লোক তাই শুন্ছে। স্কুল-কলেজের ছেলেরা স্থানে স্থানে পৃথক আসর খুলে তাস খেলা সুরু করে দিয়েছে!

মেয়ে মহলে কোলের ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটিতে কেবিনগুলি সরগরম করে তুলেছে।

মেয়েরা তাদের বোঝাচ্ছে যে, সাম্‌নে ইষ্টিশানে ভালো দুধ, মিষ্টি ফল পাওয়া যাবে—তাই কিনে রাত্রিরের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

চায়ের দোকানে ভীড় লেগেই আছে।

যুবক সম্প্রদায় সেখানে চায়ের পেয়ালায় রাজনৈতিক তুফান তুল্‌ছে আর সিগারেট ফুঁক্‌ছে।

ষ্টীমারে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

যাত্রীদল, ইস্কুল কলেজের ছাত্ররা, বাস্তুত্যাগীরা, ব্যবসায়ী মহল আর কৃষক সম্প্রদায় সকলকে নিয়ে একটি সন্ধ্যায় এক বৃহৎ পরিবার গড়ে উঠেছে।

পাটের আবাদ, ধানের মলন, ছেলের বিয়ে, মেয়ের নিকে, ফুটবল খেলা, গুড়ের মণ, মাছের অভাব, অকারণ কোন্দল, ধর্মতত্ত্ব এবং সর্বোপরি সস্তা রাজনীতি জায়গাটাকে শব্দ-ব্রহ্মের তীর্থস্থানে রূপান্তরিত করেছে। সেই সঙ্গে হুঁকো আর সিগারেট লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

খালাসীদের মুখে নীচ থেকে শব্দ ভেসে আস্ছে—

"এখানে তাল মে—লে—না !"

হঠাৎ খচাৎ করে সমস্ত ষ্টীমারটা ভূমিকম্প হওয়ার মতো যাত্রীদের কাঁপিয়ে দুলে উঠল। যারা দাঁড়িয়েছিল—তাল সাম্লাতে না পেরে এ-ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে গেল।

তারপর চারিদিকে একটা জল আলোড়নের শব্দ, তারপরই স্থির।

বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো ষ্টীমারের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি বার্তা রটে গেল যে—জাহাজ চরে আটকেছে!

তারপর ইঞ্জিনের ফোঁসফোসানি—

বাঁশীর ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস—

খালাসীদের চ্যাঁচামেচি—

কয়লার ক্রমাগত আত্মাহুতি—

কিছুতেই কিছু নয়— !

ওদিকে যাত্রীদের মধ্যে—

সমবেত—খেদ—হায় আল্লা— !

তীর্থ-যাত্রীদের করুণ কাকুতি—

একি করলে জগন্নাথ— !

মেয়েদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ—

গুষ্টির মুখে কি এখন ছাই দেবো— ?

তখুনি মিন্‌সেকে বল্লাম কিছু চিড়ে গুড় বেঁধে নাও—

সঙ্গে সঙ্গে মিন্‌সেদের দ্রুত পদ-ক্ষেপের শব্দ শোনা গেল— খাবার ও চায়ের দোকানে সব ভেঙ্গে পড়ল—

খালাসীরা চীৎকার করে উঠল—

সব একদিকে জমায়েৎ হলে জাহাজ উল্টে যাবে।

কিছুক্ষণ বাদেই ভগ্নদূতের দল জানিয়ে দিল যে,—চিড়ের দাম সাড়ে তিন টাকায় উঠেছে। গুড় যা ছিল খরচ হয়ে গেছে। আর মিষ্টি-খাবার সব ইস্কুলের ছেলেরা কিনে উদরের অগ্নিদেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করেছে।

তখন বয়স্ক কয়েকজন ব্যক্তিকে পৈতে লুকিয়ে আর টিকি আড়াল দিয়ে বাট্‌লারের আশে পাশে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখা গেল।

বাট্‌লারের মুখে আর হাসি ধরে না।

সে ঘন ঘন মাথা নাড়ে আর নীচে গিয়ে মুর্গি জবাই করে।

সন্তানবতী মেয়েদের কল্যাণকামী রূপে জমাদার আল্লাবক্সের শুভ আবির্ভাব হয়।

হাতে তার দু বালতি দুধ।

তা' দাম একটু বেশী হোক।

বাচ্চাদের ত' গলা ভিজবে।

দু' বাল্‌তি দুধের এক ফোঁটাও পড়ে রইল না। দাম যা উঠল সেটা হিসেব করতে জমাদার একেবারে হিম-সিম !

টিকিট ক্লার্কের কাছেও আবেদন নিবেদনের বিরাম নেই।

যাদের ট্যাঁকে কিছু আছে তারা গোপনে ভালো রকম দক্ষিণা দিয়ে কেবিনগুলি দখল করে ফেল্ল।

বাদ বাকি যাত্রী একেবারে মাছ-পাতুরী!

অধিকাংশ যাত্রীরই নিশিপালন করতে হল। কচি ছেলের কান্না, মহিলাদের পূজো মানসিক, বুড়োদের বিনিদ্র রজনী যাপন, ছাত্রদের আন্দোলন, কিছুই—হিন্দু-মুস্লীম প্যাক্টকে এতটুকু শিথিল করতে পারল না।

হায় মহাত্মা গান্ধী!

এই অভিনব প্যাক্টের অন্ধি-সন্ধি তিনি আজীবন তপস্যায় আয়ত্তে আন্তে পারেন নি!

তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে, আল্‌বোলা টান্‌তে টান্‌তে, নেত্রদ্বয় অর্ধ-মুদ্রিত করে, নিশ্চিন্ত আরামে আমেজ করা চলে, বাঙলা দেশের সেই সময়কার এক গণ্ড গ্রামের কাহিনী।

তখন রেশনের প্রবর্তন ও বসনের অভাব ছিলনা বলে মানুষ আজকের দিনের মতো তড়িৎ-গতি হয়ে ওঠেনি ; ফলে ফরাসের ওপর মজলিসী গল্প জমতো ভালো।

জনার্দন ভট্চাজ ভাদ্রের শেষাশেষি এক সন্ধ্যায় অহিফেনে মজলিসী মনকে মাধুর্যময় করে দীপালোকে সদ্য আগত 'সঞ্জীবনী' পাঠ করছিলেন—এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে গজানন গলুই একটা ভাঙা ছাতা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই ডান হাতে ভট্চাজের পদ স্পর্শ করে জিবে ঠেকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্লে, কর্তা শুনেছেন ?

'সঞ্জীবনী' থেকে মুখ না তুলেই জমিদার জানার্দন বল্লেন, হ্যাঁ, কল্‌কাতায় কথা-কওয়া ছবি এসেছে—এই ত' ছাপার হরফে বড় বড় করে লিখছে—

যথাসম্ভব চোখ দুটিকে বড় করে গজানন গলুই জবাব দিলে, আজ্ঞে ছবির কথাই নয়—। চক্রবর্তীরা এবার প্রতিমা হুজুরের চাইতে আধ-হাত উঁচু করেছে।

এইবার ভট্চাজ চোখের চশমাটি খুলে রাখলেন, তারপর খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন, অ্যাঁ! তুমি বল্‌ছ কি গজানন ? আমার প্রতিমা থেকে চক্কোত্তিদের প্রতিমা আধ-হাত উঁচু ? উঁহুঁ ! কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই ব্যাপারে তারও যে বিস্ময়ের পরিসীমা নেই এই রকম একটা মুখের ভাব করবার চেষ্টা করে গজানন গলুই বল্লে, আজ্ঞে, আমি নিজ কানে শুনে এলাম যে। সবাই বলাবলি করছিল যে, এবার দুর্গো পূজোয় চক্কোত্তিরা হুজুরকে হারিয়ে দিয়েছে !

—হুঁ ! হারিয়ে দিয়েছে ! ভট্চাজ গর্জে উঠলেন। বাইরে কুমোর প্রাতমায় রঙ লাগাচ্ছিল। পূজোর আর বিলম্ব নেই।

আশ্বিনের প্রথমেই দশভুজার শুভাগমন। কিন্তু জনার্দন ভট্চাজের মনে হল—দশভুজা যেন তাঁর দশ হাতের দশটি চড় তার দুইগালে কাসয়ে দিলেন!

এ পরাজয় মেনে নেয়া ত' মৃত্যুর সামিল। ভট্চাজদের প্রতিমা গাঁয়ের সকল মূর্তির ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এই ত' চিরকাল সবাই জেনে আস্ছে। ভাসানের মিছিলে ওঁদের মূর্তি সকলের শিরোভাগে।

তিনি বেঁচে থাকতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে? জনার্দন ভট্চাজের অহিফেনের নেশা ছুটে গেল। তিনি কর্মনিরত কুমোরকে আহ্বান করলেন।

কিন্তু এখন আর প্রতিমার উচ্চতা বৃদ্ধি অসম্ভব। তা' ছাড়া তৈরী প্রতিমা ভাঙা চলে না, তাতে পরিবারের অকল্যাণ হতে পারে।

নিষ্ফল আক্রোশে ভট্চাজ গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানতে লাগলেন।

গজানন গলুই মাথা চুল্‌কে বল্লে, আজ্ঞে, এক কাজ করলে হয় না? মিছিল বের করবার সময় একটা উঁচু মাচা তৈরী করে দিলেই হবে।

জনার্দন এইবার মুখ খুল্‌লেন। বল্লেন, মাচা বেঁধে আমি টেক্কা মারবো ভেবেছ? মোটেই নয়। তুমি কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ো গজানন, একদল ভালো যাত্রা বায়না করে আসবে। চক্কোত্তিরা হারাবে ভট্চাজদের? যা কোনো কালে হয়নি—সে ব্যাপার আমিও ঘটতে দেবো না।

এই জাতীয় উত্তেজনামূলক এবং মুখরোচক কাজ পেলে গজানন গলুই আর কিছুই চায় না। যাত্রা বায়না করবার অজুহাতে দু'পক্ষ থেকেই যে বেশ উপরি লাভ হবে সেই কথা অনুধাবন করে গজানন বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠল।

গজাননের এক ভাগনে চক্কোত্তিদের ওখানে চাকরি করে। রাত্তিরে তার বাড়ী গিয়ে উস্‌কে দিলে, যদি সে-ও জনার্দনের এই যাত্রা-পর্বের উল্লেখ করে অপর একটি যাত্রার দল বায়না করবার সুযোগ পায়।

মামা-ভাগ্নেতে বহুক্ষণ কি সলাপরামর্শ হল সে কথা তারাই ভালো বল্‌তে পারে। তবে আশু-প্রাপ্তি যোগের সম্ভাবনায় উভয়েই পুলকিত হয়ে উঠল।

জনার্দনের মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। স্বয়ং জনার্দন বারান্দায় একটি জলচৌকির ওপর বসে লোক জনের কাজকর্ম দেখছেন আর গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টান্‌ছেন! যুদ্ধ-জয়ের একটা গরিমা তাঁর চোখে-মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। এমন সময় ভগ্নদূতের মতো গজানন গলুই এসে উপস্থিত হল।

চোখ দুটো একবার নাচিয়ে নিয়ে জনার্দন জিজ্ঞেস কর্‌লেন, কি হে গজানন, তোমার যাত্রার আসর কেমন হচ্ছে? অধিকারীর পছন্দ হবে ত'? আর দেখ, ঐ দিকে চিকের ব্যবস্থা থাকবে। সারা গাঁয়ের মেয়েরা বসে যাত্রা শুনতে পারবে, সে আয়োজন আমি করে রাখবো। ওদিকে কাক-পক্ষীও উকি দিতে যাবে না। আমার নেমন্তন্ন হবে নারদের নেমন্তন্ন। জনার্দন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন।

গজানন গলুই এতক্ষণ ধরে হুজুরের কথাগুলি গিল্‌ছিল আর একটা সুযোগ খুঁজছিল কখন তার বক্তব্য সে সুরু করতে পারে।

হুজুরের হাসির ফাঁকে সে শুধু জোড় হস্তে নিবেদন করল,—আজ্ঞে সর্বনাশ !

জনার্দন আর একটি সুখটান দিয়ে বল্লেন, সর্বনাশ কি হে ? বরং বলো বাজীমাৎ। গজানন বল্লে, আজ্ঞে না হুজুর ! চক্কোত্তিরা কল্‌কাতা থেকে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা এনেছে। এই মাত্তর গরুর গাড়ী থেকে সব নামল কিনা। কি তাদের জাক-জমক, সাতটা কাঠের বাক্স ভর্তি শুধু রঙ-বেরঙের পোষাক। লোকজন সব ধরাধরি করে নামাচ্ছে। অধিকারীর বিরাট চেহারা।

জনার্দনের মুখটি হঠাৎ আম্‌সির মতো শুকিয়ে গেল। কিছুক্ষণ তার মুখে যেন কে বোবা কাঠি ছুঁয়ে দিলে।

অ্যাঁ ! থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি ! কলকাতা ! এই কথাটি অসংলগ্ন ভাবে তার মুখ থেকে খানিক বাদে বেরুল !

হুজুরকে এতখানি মুষড়ে পড়তে দেখে বোধ হয় গজানন গলুইয়েরও দয়া হল।

একটুখানি মাথা চুল্‌কে নিয়ে বল্লে, আজ্ঞে, ওদের যাত্রা দলের ছোক্‌রা অনেক বেশী হবে বটে ··· তবে আমাদের হবে রাম-রাবণের যুদ্ধ। আপনার ভিটে বাড়ীর যত প্রজা আছে সবাইকে ল্যাজ লাগিয়ে বানর সাজিয়ে দেবো ··· তারাই আসর মাৎ করে দিতে পারবে।

জনার্দন চোখ বন্ধ করে বল্লেন, যা হয় করো গজানন, আমি আর কিছু ভাবতে পাচ্ছিনে।

গলুই মশাই তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না হুজুর, আসর মাৎ আমরা করবই।

সেদিন রাত্তিরে মামা-ভাগ্নের কথা হচ্ছিল।

ভাগনে বল্লে, ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি দিয়েছিলে মামা, তাইত' হু'-হুটো যাত্রার দল গাঁয়ে এলো। খুব মজা করে যাত্রা দেখে নেয়া যাবে।

মামা ফোঁড়ন দিয়ে জবাব দিলে, আরে রেখে দে তোর যাত্রা! মিছি মিছি রাত জেগে শরীর নষ্ট করবার কোন মানে হয়? ট্যাঁক ভারী হ'ল কিনা সেই হিসেব আগে গিয়ে কর।

গাঁয়ের লোক কিন্তু থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির চাইতে ভট্চাজ বাড়ীর রাম-রাবণের যুদ্ধই পছন্দ করল বেশী। একে মুখপোড়া হনুমানের লম্বা লাফ, তার ওপর গাঁয়ের যত চেনা লোক বানর সৈন্য সেজে হুপ-হুপ শব্দে আসর গরম করে তুলেছিল! তার কাছে চক্কোত্তি বাড়ীর "নহুষ-উদ্ধার" পালা একেবারে যেন ঠাণ্ডা মিয়োনো মুড়ির মতো নেতিয়ে পড়ল।

যাত্রা আনার ব্যাপারে চক্কোত্তিদের খরচ হয়েছিল বেশী। কেননা খাস কল্‌কাতার দল—তাদের খাঁই বেশী। তাই জলের মতো টাকা খরচ করেও সুনাম হল না দেখে তাঁরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

গোপনে-গোপনে ঠিক করলেন—দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করে ভট্চাজ বাড়ীর খ্যাতির ব্যারোমিটার কয়েক ডিগ্রী নামিয়ে

দেবেন। 'ছোটলোক'দের চূড়ান্ত খাওয়া খাওয়াতে হবে। যাকে বলে একেবারে ফাঁসির খাওয়া। তাতে যদি গোটা কয়েক লোক মরে ত' মরুক, কিন্তু চক্কোত্তি বাড়ীর দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়বে।

কথাটা যথাসময়ে ভট্চাজ বাড়ী পৌঁছুতেও বিলম্ব কর্‌ল না। তুই পক্ষই গোপনে চিঁড়ে-দৈ থেকে স্থরু করে সব রকম খাবারের আয়োজন করতে লাগল। ভট্চাজ বাড়ী যদি কাক-পক্ষীর মুখে শুনতে পেলেন, যে চক্কোত্তি বাড়ী বর্ধমানের সীতা ভোগ আনাচ্ছেন; অমনি জনার্দনের গোমস্তা ছুটল কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া সংগ্রহ করতে।

উদ্যোগ-পর্ব দেখে মনে হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষণে কৌরব-পাণ্ডবও নিজেদের জয় সম্পর্কে এতখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

তারপর এলো সেই স্মরণীয় দিন। গ্রামবাসিগণ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো—

কাতারে কাতারে লোক! কেউ খেলো, কেউ ছাঁদা বাঁধল, আবার অনেককে চ্যাংদোলা করে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হল। এবার কিন্তু চক্কোত্তি বাড়ীর জয়-জয়কার পড়ে গেল। কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কিন্তু হক্‌চকিয়ে যেতে হবে। গাঁয়ের লোক সমস্বরে বলে, ভট্চাজ বাড়ী আর এমন কি খাইয়েছিল? হ্যাঁ খাওয়াল বটে চক্কোত্তিরা। সেই খাওয়া খেয়ে বাইশ জন লোক ওলা বিবির দয়ায় মারা গেল! আর ভট্চাজ বাড়ী পাত পেতে কারো পেটের ব্যথা পর্যন্ত হল না। ওটা আবার খাওয়া নাকি?

জনার্দন ভট্চাজ কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নন।

গজানন গলুইকে ডেকে বল্লেন, এবার নতুন প্যাঁচ কসতে হবে। তুমি পাঁচশ' ঢাকী বায়না কর। প্রতিমা বিসর্জনের সময় এই পাঁচশ' ঢাক এক সঙ্গে বাজবে। গোটা গাঁয়ের লোকের কানে তালা লাগিয়ে দেয়া চাই। দেখি কেমন আমার জিত না হয়।

গজানন হাত জোড় করে বল্লে, হুজুর, এইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। আপনি এমন খাওয়াটা খাওয়ালেন, আর গাঁয়ের লোকে বল্লে কিনা, কেউ কলেরা হয়ে মারা যায়নি! বলে, আপনার দেয়া 'ফলার' ফলারই নয়। —মজাটা এবার টের পাবে সবাই।

ওদিকে গজাননের ভাগ্নের কাছ থেকে খবর পেয়ে চক্কোত্তি চুপ করে বসে রইলেন না।

দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনে জয়লাভ করে তাঁদের বুকের ছাতি দশ হাত ফুলে উঠেছে। তলে তলে তাঁরাও হাজার ঢাকির বায়না করে বসে রইলেন।

প্রতিমা বিসর্জনের দিন সকাল থেকে গাঁয়ে কান পাতে কার সাধ্যি?

দেড় হাজার ঢাকি প্রাণপণে ঢাক পিটছে। ফলে হাতের কাছের মানুষটিকে পর্যন্ত একটা কথা বলতে হলে বুকফাটা চীৎকার করতে হচ্ছে!

এই বাজনা চল্‌ল তিন রাত্তির তিন দিন।

নব বিবাহিত দম্পতিদের কান-কথা বন্ধ হয়ে গেল! বাসর ঘরে কেউ আড়ি পাতে না—গোটা গাঁয়ের কাক-চিল পালিয়ে ভিন্ গাঁয়ে আশ্রয় নিলে। গরুর বাঁটে দুধ গেল শুকিয়ে—

চতুর্থ দিন সকাল বেলা ভট্চাজদের পাঁচশ ঢাকির ঢাক গেল ফেঁসে—!

জনার্দন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

সেই দিন সন্ধ্যে-বেলা গাঁয়ের মাত-ব্বরেরা ভট্চাজ বাড়ী সমবেত হয়ে মত প্রকাশ করলেন, এইবার তোমারই জিত হয়েছে জনার্দন ভায়া। ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি!
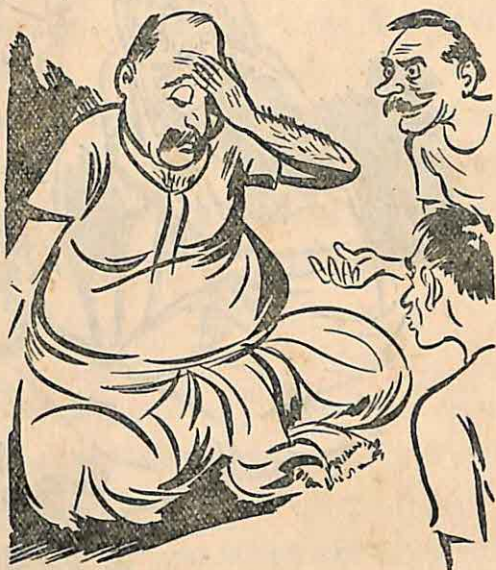
অনেক অনুশীলনের অন্তে অসাধ্য-সাধন করা গেল। অসাধ্য সাধনের কথা শুনে পাঠক-পাঠিকারা হয়ত আন্দাজ করে নেবেন যে, আমি চন্দ্রগ্রহে যাবার একটি পাশপোর্ট সংগ্রহ করেছি। কিন্তু বিষয়টি মোটেই জগৎ-বহির্ভূত নয়, ধূলি-মলিন এই মাটির পৃথিবীরই কথা !

ব্যাপারটা আরও ঘরোয়া করে বল্লে, এই দাঁড়ায় যে, বহু

হাঁটাহাঁটি করে, জুতোর সুকতলা খুইয়ে, বাড়ীওয়ালাকে বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত করে, বহুবিধ সাধ্য-সাধনা অন্তে একটি ফ্ল্যাট সংগ্রহ করেছি।

আপনারা একবারও মনে করবেন না যে, শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভিজেছে।

বেশ কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে এর পেছনে। আপনাদের কাছে গোপন করে লাভ নেই, পাকিস্তানে ঘর-বাড়ী বিক্রি করে যে হাজার টাকা ট্যাঁকে নিয়ে কলকাতা সহরে এসেছিলাম তার প্রায় সবই বাড়ীওয়ালার গহ্বরে গেছে, সেলামী ও আগাম বাড়ী-ভাড়া বাবদ।

তা যাক্।

তবু এখন ফ্ল্যাটের বারান্দায় ছোট্ট একটি মাদুর বিছিয়ে ভাবতে পারবো, ভিটেমাটি গেছে যাক্, নিরিবিলি ঘুমোবার ত' ছোটোখাটো ঠাঁই মিলেছে।

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে, সর্বনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়। আমি না হয় তাঁদের কথা আরো একটু বেশী মেনে নিয়ে গোটাগুটিই "ত্বয়া হৃষিকেশ" করে বসে আছি। এতে অন্যায়টা কি করেছি বলুন?

যা ডামাডোলের বাজার পড়েছে, নেংটের নেই বাটপাড়ের ভয়!

আমার সংসারে ঝামেলা কম।

স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছেলে। কাজেই রেশন কার্ডের বাইরে কালো বাজার থেকে চাল কিনতে হয় না। দশটা-পাঁচটা অফিস

ক'রে মনে করি আমিই বা কে আর রাণী এলিজাবেথের কুমারই বা কে।

গৃহিণীর মুখে হাসি-খুসি যেন উপচে পড়েছে। বললেন, দুটি ঘর বটে কিন্তু ভারী সুন্দর। ভেতরের ঘর হবে শোবার আর বাইরের ঘরে তোমার ছত্রিশ-জাতের বন্ধু আসুক, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু একটি নোটিশ আগে থাক্‌তেই দিয়ে রাখছি, চা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে না-মঞ্জুর হবে। তবে যদি ঝোলা-গুড়ে আপত্তি না থাকে, নেহাৎ ঝোলাঝুলি করলে সকাল-সন্ধ্যে কয়েক কাপ পেলেও পেতে পারো।

করজোড়ে বললাম, তথাস্তু দেবি !

তারপর, মুদ্রিত নেত্রে জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ করে নিবেদন করলাম, এখন আর কোন কিছুতেই আপত্তি নেই, রাত্তিরে একটু ঘুমিয়ে বাঁচবো।

গৃহিণী কথাটায় সায় দিলেন এবং ঘুমটাকে আরামদায়ক ও মধুরতর করবার জন্যে বালিশের ওপর সদ্য রজক-গৃহ-প্রত্যাগত শ্বেতবকপাখা-সদৃশ তোয়ালে পেতে—দিশি মতে (থুড়ি মোগলাই মতে) একটু আতর ছিটিয়ে দিলেন।

এর পরেও যদি সুনিদ্রা না হয় তবে যেন অনিদ্রার 'ইনজেক্‌শন' নি—তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে।

* * *

না, ঘুমের দোষ দিতে পারিনে।

ঘুম এসেছিল এবং মায়ের কোলের মধুর দোলানির মতো সেই আবেশ আমার বিস্মৃতির অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল কেন! বালিশে ছারপোকা নেই, মনে নেই ময়লা। পাশে প্রেয়সী, আতরের গন্ধে গোটা ঘর ভুর্ ভুর্ করছে, তবু ঘুম ভাঙে কেন?

ঘুমটা ভাঙ্‌বার পরও কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। চুপ্ চাপ ভাবতে লাগ্‌লাম, ভাল কাট্‌লো কোথায়?

শুন্‌তে পাই অতি আনন্দেও লোকে কাঁদে। আমারও কি সেই দশা হল নাকি?

আর না-ই বা হবে কেন? কথায় বলে, কুকুরের পেটে ঘী সয় না!

অনেক দিন পরে আরামের বিছানা পেয়ে অসুবিধায় অভ্যস্ত দেহ বোধ করি ধর্মঘট করবার মতলব আঁট্‌ছে!—না-না, তা ত' নয়!

সেলামী আর ছ'মাসের ভাড়ার টাকা, সবটাই জলে গেল না ত?

ওই ত' আবার কে যেন নাকি-কান্না সুরু করে দিলে! গিন্নীকে ঠেলে জাগিয়ে দেবো কিনা ভাবছি এমন সময় নাকি কান্নার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে গুরু গম্ভীর গলায় ধম্‌কানি শোনা গেল!

রাম বলো!

ঘাম দিয়ে সত্যি জ্বর ছাড়লো!

তা হলে আসল ভুত নয়—, মানুষ ভুত!

পাশের ফ্ল্যাটে যেন অহি-নকুলের যুদ্ধ চলছে!

আর কিছু ঘোষণা করবার পূর্বেই গৃহিণী জেগে উঠ্‌লেন, তার পর সভয়ে বললেন, শুন্‌ছ, একটা মাতাল বোধ করি তার বৌকে ধরে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে।

দেখলাম, আমার চাইতে আমার গৃহিণী রোগনির্ণয়ে অধিকতর পটু। ডাক্তারী বিদ্যে জানা থাক্‌লে বেশ ভালো রকম পশার জম্‌ত!

স্ত্রী-ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ গর্বিত হয়ে উঠ্‌লাম এবং পাশের ফ্ল্যাটের মাতাল স্বামীরত্নটিকে যে বেশ শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন, দৃঢ় কণ্ঠে সেই অভিমত ব্যক্ত করলাম।

কিন্তু গৃহিণী সাবধান করে দিলেন যে, মাতালদের কোনো কাণ্ড-জ্ঞান নেই···ঝোঁকের মাথায় তারা নাকি যে কোনো লোকের গায়ে বমি করে দিতে পারে!

শুনে—মনে এমন ভাব জাগ্‌লো না যাতে দরজা খুলে পাশের ফ্ল্যাটের স্বামীরত্নটিকে শিক্ষা দেবার সদিচ্ছা বলবৎ থাকে!

আরো কিছুক্ষণ চুপ চাপ থম্ থমে আবহাওয়ায় কাটলো; তার পর নিষ্ক্রিয়তার উল্টো হাওয়ায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আর আদপেই খেয়াল নেই।

পরদিন সকাল বেলায় মনে কোনো কৌতূহলই জেগে রইল না। কেননা কেরাণীদের সকাল বেলাটা রেসের ঘোড়ার মতোই তড়িৎ-গতিতে কাটে।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে বাজার পর্ব শেষ করতে হবে। তার পর ওরই ফাঁকে রয়েছে সংবাদ-পত্র পাঠের সঙ্গে ঈষদুষ্ণ চা পান।

গৃহিণীর সঙ্গে গবেষণা করি সে অবসর কোথায়? কোনো রকমে নাকে-মুখে গুঁজে—বাঁ হাতে পান নিয়ে, ডান হাতে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে সার্কাসের কসরৎ করতে করতে কেরাণীকুল যে ভাবে

ডালহৌসি স্কোয়ারে অফিস করে, ভবিষ্যৎ কালে তা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয় হয়ে রইল।

কিন্তু অফিস-অন্তে জীবনটা হয়ে আসে বেশ মন্থর। কালিদাসের কালের মতো আর কোন ত্বরা থাকে না। ট্রামে-বাসে যদি অত্যধিক ভীড় হয়···হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে না হয় চলেই এলাম। আমাদের সনাতন ফুটপাথ ত' আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

গৃহিণী যেন গৃহে একেবারে আমার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। বিয়ের অব্যবহিত পরেও আমার অপেক্ষায় এতটা ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখিনি।

শ্রীমতীর চোখে-মুখে আমেরিকা আবিষ্কারের উৎসাহ!

মুখ টিপে হেসে বল্লেন, দুপুর বেলা সব কিছু জানা গেল।

—কী জানা গেল? আমি বিস্মিত হয়ে উঠি। আমার পুরাণো ধুতি খানকয়েক লুকিয়ে রেখেছিলাম। শ্রীমতী তাই আবিষ্কার করে বাসন-ওয়ালির কাছ থেকে আজে-বাজে বাসন কিনে বসেন নি ত?

—কিন্তু না; গেরস্তালীর পথে এতখানি পুলক সঞ্চারের কথা নয়।

অবাক্ হয়ে চির-পরিচিত গৃহিণীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলাম।

শ্রীমতী তখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন—পাশের ফ্ল্যাটের বৌটি নাকি নিরিবিলি দুপুরে তার সঙ্গে ভাব করে গেছে। টাকা-পয়সার অভাব নেই ওদের। ব্যাঙ্কে মোটা টাকা সঞ্চিত আছে।

কিন্তু স্বামীর ঘোড়া-রোগ আর মদের নেশা। নইলে মানুষ নাকি তিনি মন্দ নন।

মনে মনে বললাম মানুষ তিনি ভালো হোন্‌, তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই, কিন্তু দুপুর রাত্তিরে পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের ঘুম ভাঙাবার রোগটি ত' ভালো নয়! বেশী বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে খবর দিতে হবে।

আমার নিরুৎসাহ মুখখানি নিরীক্ষণ করে গৃহিণী বোধ করি হতাশ হয়ে গেলেন। কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী তিনি নন। তাই বললেন, বৌটিও ভারী হাসিখুশী—মিশুকে।

এইবার আমি মুখ খুললাম।

—তবে দুপুর রাত্তিরে পেত্নীর মত নাকি-কান্না সুরু করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছিলেন কেন?

শ্রীমতী হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন, তারও একটা কারণ আছে। ওর স্বামীটি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়লেই ক্রমাগত ওকেও মদ খেতে জিদ করতে থাকে! তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া···শেষকালে ধরে একেবারে মার! বৌটি বললে, ওর স্বামী নাকি ওকে সত্যি ভালোবাসে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, হ্যাঁ, ভালোবাসার নমুনা কাল রাত্রে যা দেখিয়েছেন···একেবারে পেটের পিলে চম্‌কে উঠেছিল।

এইবার গৃহিণী চটে উঠলেন বলে মনে হল।

বঙ্কিম ভ্রূ-নির্দেশে বললেন, তোমরা সব জিনিসটারই উল্টো মানে করে বসে থাকো। ওর বৌ বল্‌ছে খুব ভালোবাসে···আর তোমার তাতে অবিশ্বাস! তুমি ত' আর ভদ্রলোককে নিয়ে ঘর করো না!

অকাট্য যুক্তি !

এর ওপর আর কোনো প্রতিবাদ করা চলে না !

পরবর্তী তুটো রাত বিনা উপদ্রবে—একটানা ঘুমে বেশ কাটল।

সেদিন অফিসে বড়বাবুর দাঁত-মুখ খিঁচুনি খেয়ে মন-মেজাজ ভারী বিগ্‌ড়ে ছিল।

তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাত্রে···আবার সেই বড়বাবুর গোঁফওয়ালা বদনে পান ভর্তী বিকৃত মুখ···আর তারই সঙ্গে দাঁতমুখ খিঁচুনি···

চীৎকার ক্রমে বেড়ে উঠল।

কিন্তু না, এ ত' বড়বাবুর আস্ফালন নয়···পাশের ফ্ল্যাট থেকেই হুমকিটা আসছে বলেই মনে হল !

বড়বাবুর হুমকিটা পাশের ফ্ল্যাটের মাতালের চীৎকারের সাথে দিব্যি মিশে গেল।

সিনেমার লোক হলে বলত, এরই নাম হচ্ছে আর্ট···বড়বাবুর দাঁত-মুখ খিচুনি 'ডিজলভ্‌' হয়ে পাশের বাড়ীর চীৎকারে রূপান্তরিত হল।

হঠাৎ আবার বৌটির নাকি-কান্না সুরু হল। নাঃ! এদের পতি-পত্নী প্রেমের ঠ্যালায় আমি গরীব কেরাণী প্রাণে মারা যাই।

গিন্নীকে ঠ্যালা দিয়ে জাগিয়ে বল্লাম, কি রকম ভালবাসার প্রতিযোগিতা চল্‌ছে শুন্‌তে পাচ্ছ ত ?

গিন্নী জেগে উঠেছেন বুঝতে পারলাম, কিন্তু কোনোরকম সাড়া দিলেন না।

যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো শক্ত। তাই সে চেষ্টা

না করে দাম্পত্য-প্রেমের গতি শুয়ে শুয়ে অনুধাবন করতে লাগলাম।

হঠাৎ বৌটি আচমকা এমন একটা চীৎকার করে উঠল যে মনে হল···তার মাথায় বুঝি ডাণ্ডা মারা হয়েছে।

এইবার আমার শ্রীমতী নীরবতা ভঙ্গ করলেন, বল্লেন, বলি চুপ করে শুয়েই থাকবে? একটু ওঠো না—বৌটাকে যে একেবারে মেরে ফেল্লে?

অফিসে বড়বাবু, আর বাড়ীতে রয়েছে পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক। যদিও তারে চোখে দেখিনি···শুধু বাঁশী শুনেছি!

গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, প্রয়োজন থাকে পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি গিয়ে মোলাকাৎ করতে পারো, আমার অতখানি উৎসাহ নেই।

শ্রীমতী বল্লেন, আমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

অনাসক্ত ভাবে উত্তর দিলাম, মাথা যার সত্যি খারাপ হয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত হতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—আর তা ছাড়া তুমিই ত' বলেছ, মাতালরা যে কোনো মুহূর্তে গায়ে বমি করে দিতে পারে। সে বমি ত' শেষ পর্যন্ত তোমাকেই মুক্ত করতে হবে।

শ্রীমতীকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝলাম ওষুধ ঠিক ধরেছে।

নাঃ, আর ত' পারা যায় না।

ভদ্রলোকের হুঙ্কার যেন ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। জীবনে এক-

এক সময় এমন বিরক্তি আসে যখন অবলীলাক্রমে একটা মানুষকে খুন করে ফেলা চলে।

কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ। মনে যখন ইচ্ছে জাগে বড়বাবুর গোঁফ ধরে এক টান মারি, তখন মাথা চুলকে বলতে হয়, আজ্ঞে, এ রকমটি আর কখনো হবে না।

মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মানুষের মনে খুন চেপে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়; মনস্তাত্ত্বিকেরা হয় ত' সেই কথাই বলবেন।

ক্রমাগত চীৎকার শুনে শুনে আমিও ক্ষেপে গেলাম। শ্রীমতীকে ডেকে বল্লাম, দেখ, ঘুমের দফা যখন গয়া, তখন ওদেরও শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না! আমাদের সেই পুরোণো ঝরে-ঝরে চোঙ-ওয়ালা গ্রামোফোনটা আছে, সেইটেই চাবি লাগিয়ে একটা রেকর্ড চাপিয়ে দাও ত' দেখি, কপোত-কপোতী কেমন করে ঝগড়া করে!

গৃহিণী রেগে উঠে বল্লেন, দুপুর রাত্তিরে গ্রামোফোন? তুমিও কি আজকাল মদ ধরেছে নাকি?

আমি বল্লাম, ধরিনি, তবে ধরবো ব'লে স্থির করেছি। কেননা, মদই হচ্ছে ভালোবাসার ব্যারোমিটার!

মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে গৃহিণী পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু আমার চোখের ঘুম নেই।

যাহোক একটা কিছু কাণ্ড আমায় করতেই হবে। সত্যি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

পাকিস্তান থেকে চলে আসবার মুখে ঠাকুর্দার আমলের চোঙ

দেয়া এই 'কলের গান'টা নিয়ে এসেছিলাম। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তার যে এমন প্রয়োজন হবে সে কথা ইতিপূর্বে ভাবতে পারি নি।

পুরোণো জিনষ-পত্র হাতড়ে সেটা বের করে নিয়ে এসে ক'ষে চাবি লাগিয়ে দিলাম।

ওদিকে চীৎকারের মাত্রা উদারা—মুদারা ছেড়ে একেবারে তারায় উঠে গেছে!

রকর্ডও কি ছাই আছে!

সেই পুরোণো আমলের গোটা কয়েক বহু ব্যবহৃত ভাঙ্গা রেকর্ড।

অবশেষে বেজে উঠল গ্রামোফোন রেকর্ড তার বিকৃত স্বর নিয়ে—

"আমি তোমার জন্যে কাঁদি—

তোমার প্রাণ কি কাঁদে নারে?"

ভাবলাম—এইবার ঝগড়াটে সুখী-দম্পতি গলা আরো চড়াবে। ভদ্রলোকের কর্কশ কণ্ঠ ছাড়িয়ে যাবার দাবী রাখে এমন গানের নমুনা দেখাতে পেরে আমিও মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলাম।

সত্যি! কি অবাক্ কাণ্ড!

গান শুনে ভদ্রলোক একেবারে চুপ।

ব্যাপারটা কি, ঠিক বোঝা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বদ্ধ দরজায় করাঘাত শোনা গেল।

আমরা কর্তা-গিন্নি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বাড়ী চড়াও করে মারামারি করতে এলো নাকি?

আবার শব্দ।

তারই সাথে আবার চাপা মেয়েলী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ও দিদি, শীগ্‌গির দরজাটা একবার খোলো না।

শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকালাম। গৃহিণী বল্লেন, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে, নইলে এত রাত্তিরে এসে কেউ দরজা ধাক্কায়?

নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলাম, যাওনা দরজা খুলে তোমার নতুন পাওয়া বান্ধবীর কথা শোনো—

গৃহিণী দুই চোখে অগ্নি বর্ষণ করে বিছানা ছেড়ে উঠে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ফিস্-ফিস্ আলোচনা চললো আমার বৈঠকখানা ঘরে।

আধঘণ্টা পরে শ্রীমতী ফিরে আসতে যে সন্দেশ পাওয়া গেল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব।

পাশের বাড়ীর কর্তা নাকি ওই রাসভনিন্দিত কলের গান শুনে চুপ মেরে গেলেন। বৌটির বিবরণে প্রকাশ, সাপের মাথায় যেন ধূলোপড়া দেয়া হয়েছে। এতদিন দুরারোগ্য ব্যাধির টোটকা মিলেছে! কাজেই ওই রেকর্ডটি তার চাই।

*　　　　*　　　　*　　　　*

রেকর্ডটিকে হাতছাড়া করতে হয়েছে। তবে আমরা তার বদলে রাত্তিরের নিরুপদ্রব-নিদ্রা ফিরে পেয়েছি। মাঝে মাঝে যখন গভীর রাত্রে ভাঙ্গা কণ্ঠের গান শুনে—

“আমি তোমার জন্যে কাঁদি
তোমার প্রাণ কি কাঁদে নারে—”

—তখুনি স্বামী-স্ত্রী বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, সাপের মাথায় ধূলোপড়া দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে!

সকালে ঘুম ভাঙ্‌তেই রামগোবিন্দের মনে হল—আজ তার নবজীবন। সারা জীবন তপস্যার পর আজ সে সাফল্য লাভ করেছে।

পাঠক-পাঠিকা হয়ত মনে করছেন—শ্রীমান রামগোবিন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছে।

কিন্তু তা নয়। খবর আরও চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। সাত বছর ষ্টুডিও অঞ্চলে ঘোরাঘুরির পর আজ সে বাল্মীকি চিত্র প্রতিষ্ঠানের নির্মিয়মান চিত্র "আলুথালুকেশা" ছবিতে সর্বপ্রথম একটা সুযোগ পেয়েছে।

পরিচালকমশাই বহুক্ষণ ধরে তার চেহারা নিরীক্ষণ করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তার চোখ ও নাক যেমন অভিনব—তাতে গুণ্ডার পার্ট সে 'রিয়ালিষ্টিক্' ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারবে।

যদিও এই বিশিষ্ট ভূমিকায় কোন 'বচন' বল্‌বার অধিকার সে পায় নি—কিন্তু পরিচালকমশাই তাকে গোপনে ডেকে বলে দিয়েছেন, ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশের বহু সুযোগ আছে এই অংশে। রূপসজ্জাই নাকি উল্লেখযোগ্য হবে গুণ্ডাটির। এমন পার্ট করতে হবে যে, চিত্রটি যখন পর্দায় প্রতিফলিত হবে, ছেলে মেয়েরা ভয়ে আঁৎকে উঠবে, তরুণীরা শঙ্কিত হয়ে পার্শ্ববর্তী দর্শককে জড়িয়ে ধরবে, স্বামী স্ত্রীর অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করবে, শিক্ষক ছাত্রকে পীড়ন করা ভুলে যাবে, ছাত্রের মনে নকল কার্যে বাধা-দানকারী শিক্ষককে শিক্ষা-দান স্পৃহা জেগে উঠবে এবং বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রার বাসনা জাগরিত হবে।

গত রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাই রামগোবিন্দ বহুক্ষণ ধরে আয়নার সামনে বহুবিধ মুখ-বিকৃতি করে গুণ্ডার ভূমিকাটি আয়ত্ত করে নিয়েছে।

আজ দুপুর বেলা সেই দৃশ্যেরই স্যুটিং হবে। ঝিকে বকে, চাকরকে হুম্‌কি দিয়ে, ঠাকুরকে তাগিদ দিয়ে সে সকাল থেকেই 'সিন্‌-ক্রিয়েট্' করতে সুরু করে দিলে। বন্ধু-বান্ধবদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিলে—"আলুথালুকেশা" যখন পর্দায় প্রতিফলিত হবে—তখন সে তাদের "পাশ" দিয়ে আপ্যায়িত করবে, কিন্তু তারা 'মেক্‌-আপে'র আড়ালে রামগোবিন্দকে হয়ত চিন্‌তেই

পারবে না! পরিচালক মশাই বলে দিয়েছেন, তাকে সাজাবার জন্যে বিশেষ রূপসজ্জাকারী নিয়োগ করা হয়েছে।

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা গৃহে রওনা হবার আগে যেমন তাড়াহুড়ো করে, রামগোবিন্দ তার চাইতেও তৎপর হয়ে তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বেরিয়ে এলো। সবাই ডালহৌসী স্কোয়ারের যাত্রী। কিন্তু কেউ জানে না—ভাবীকালের বিশিষ্ট চিত্রতারকা রামগোবিন্দ পতিতুণ্ডী তাদের পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। কিন্তু পর পর দু'খানা ছবিতে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে সে যখন নিজের গাড়ীতে চড়ে, ধূলো উড়িয়ে টালিগঞ্জের দিকে রওনা হবে—তখন তাকে দেখবার জন্যে, আর চকিতে তার ছবি তুলে নেবার বাসনায়, বাড়ীর সামনে ভীড় জমে থাক্‌বে; এই সব হতভাগ্য কেরাণীরা তখন রামগোবিন্দ পতিতুণ্ডির মোটরের ধূলো খেয়ে ট্রামেবাসে ওঠবার জন্যে ছুটোছুটি করবে এবং গলদঘর্ম হয়ে একটা সিট্ জোগাড় করে চল্‌তি সিনেমা পত্রিকায় "নবোদিত সিনেমা তাড়কার (!) একটি দিন" পাঠ করতে করতে অফিসে হাজির হয়ে দেরী হওয়ার জন্যে বড়বাবু ভৎর্সনা গলাধঃকরণ করবে নীরবে।

সত্যি ওদের দুর্দশার কথা ভেবে দুঃখ হতে লাগলো রামগোবিন্দের। হারুণ-অল-রসিদ যেমন লুকিয়ে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বেড়াত —আজ রামগোবিন্দেরও ঠিক সেই রকম ছদ্মবেশ ধারণ। এ ত' তার আসল রূপ নয়! আসল রূপ ফুটে উঠবে—সেই আগামী দিনের "নবোদিত সিনেমা তাড়কার (!) একটি দিন" আলেখ্যে।

টালিগঞ্জের পথে তাকে দুবার বাস থেকে নামতে হল। একবার ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ীতে আর একবার কালীঘাটের পীঠস্থানে। সেখানে

সে তার গোপন কামনা শতবার নাক-কান মলা খেয়ে আর মাথা খুঁড়ে জানিয়ে এলো। মা পাষাণী বলে সেই গোপন-কথা আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে না। এই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

ষ্টুডিওতে পৌঁছে দেখল, সেটিংস ডিপার্টমেণ্ট দৃশ্য পরিকল্পনার কাজে বিশেষ তৎপর। তখনো আর কেউ এসে পৌঁছয় নি।

রামগোবিন্দ আপন মনে পা দোলাতে লাগলো আর দেশের লোকের সময়ানুবর্তিতা নেই ব'লে ভারতবাসী জগৎ-সভায় ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে এই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

একে একে সবাই আসতে লাগলেন, এলেন প্রোডাকসন ম্যানেজার, সহকারী পরিচালক দল, খাবারের লোকেরা, মেকাপ-ম্যান প্রভৃতি। রামগোবিন্দ মেকাপম্যানকে নিয়ে নিজের ভূমিকা ও বাসনা-কামনার কথা সালঙ্কারে জানালো। সে এমনি বেরসিক যে পরিচালকের অনুমতি না পেলে কিছু করতেই রাজি হল না। রামগোবিন্দ তাকে একথাও জানিয়ে দিতে ভুল্‌লো না যে, সেই হবে ভাবীকালের 'লনচ্যানী'।

মেকাপম্যান অবজ্ঞার হাসি হেসে জানতে চাইলে, লনচ্যানী দেবযানীর কেউ হয় কিনা!

পর্বত-প্রমাণ মূর্খামীর সম্মুখীন হয়ে রাগ ও দুঃখে রামগোবিন্দ চুপ করে বসে রইল। ভাবলে, বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে লাভ কি?

অবশেষে এলেন পরিচালক ও ছবির নায়িকা।

আজ কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্য তোলা হবে—তার সবগুলিই

নায়িকাকে নিয়ে। শেষ দৃশ্যে গুণ্ডা নায়িকাকে তাড়া করলে সে প্রাণের ভয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এই হচ্ছে চিত্র-নাট্যের বিষয়-বস্তু।

পরিচালক বল্লেন, রামগোবিন্দ, তোমার সিনটি সকলের শেষে তোলা হবে।

সে জবাব দিলে, তা হোক স্যার। আপনি মেকাপ-ম্যানকে বলে দিন, আমার সাজতে ত' অনেক সময় লাগবে। টাইপ পার্ট ...সম্পূর্ণ অভিনব টাইপ যেন হয়—আপনি এই নির্দেশ দিয়ে দিন।

মুচকি হেসে পরিচালক মেকাপ-ম্যানকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বলে দিলেন।

নায়িকার জন্যে ত' আলাদা ঘর—আলাদা মেক্-আপ্! সুতরাং রামগোবিন্দ মনের আশ মিটিয়ে সাজতে বসল অন্য ঘরে। মেকাপ-ম্যানের হাতে কাজ চলে, আর রামগোবিন্দের নির্দেশ চলে মুখে। ভ্রূর শেষ অংশটা যেন কপালে গিয়ে ওঠে...চোখের মণি ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে ত? একটা নকল দাঁত এমনভাবে তৈরি করে দিতে হবে যেটা দেখলেই দর্শকরা বুঝতে পারবে—ভূমিকাটি কি!

মেকাপ-ম্যানের হাতেও সেদিন বিশেষ কাজ নেই...বহুক্ষণ ধরে ...সে আবদার রক্ষা করে এই নবতম চিত্র তাড়কার! কোনো নতুন পড়ুয়া পাঠশালায় ভর্তী হলে পণ্ডিত মশাই যেমন সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায়—অনেকটা সেই অনুকম্পা নিয়ে সব আবদার রক্ষা করে রূপসজ্জাকর।

একটি দুর্দান্ত গুণ্ডায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে রামগোবিন্দ। শেষ

তুলির টান দিয়ে মেকাপ-ম্যান বলে, দেখুন ত' নিজেকে চিন্‌তে পারেন কিনা ?

আয়নার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে ওঠে রামগোবিন্দ। বলে, হ্যাঁ, আপনার হাতের মুন্সিয়ানা আছে। এমন টাইপের সৃষ্টি করবো যে, সিনেমা-জগৎ চিরকাল মনে করে রাখবে।

সেদিন সুটিংএর আগেই এই নবতম তাড়কা একটা খণ্ড-প্রলয়ের সৃষ্টি করে। তার রূপসজ্জা দেখে নায়িকা হুম্‌ড়ি খেতে খেতে নিজেকে সামলে নেয়, দারোয়ান দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে, খাবারওলা মনে মনে খাবি খেতে থাকে! এমন কি পরিচালক পর্যন্ত প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন! রামগোবিন্দ তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বলে, আপনি আশীর্বাদ করুন—আমি যেন "লন্‌চ্যানি অফ্‌ বেঙ্গল" হ'তে পারি!

অন্যান্য ফ্লোর থেকে খবর পেয়ে লোক ছুটে আসে। গুণ্ডাকে দেখতে ভীড় জমে যায়!

নায়িকা বলে, এই গুণ্ডা যদি সত্যি আমায় তাড়া করে তবে আগে থেকেই আমি হার্টফেল করে বসে থাকবো।

সেদিন গোটা ষ্টুডিওর সবাইকার মতামত গ্রহণ করে রামগোবিন্দ। সেটিংস্ ডিপার্টমেণ্টের মিস্ত্রি থেকে সুরু করে চা পরিবেশনের বেয়ারা পর্যন্ত তার প্রশ্নে হক্‌চকিয়ে ওঠে।

এ ঘর থেকে ও ঘরে—এ ফ্লোর থেকে ও ফ্লোরে অবারিত অভিযান চলে তার।

চা দিতে এসে বলে, না—না—আজ আর চা নয়, মেকাপ উঠে যাবে! দুপুর বেলা যখন খাবার আসে—সে আঁতকে উঠে বলে, ওরে বাবা! এখন খাবার খেতে গেলে আমার নকল দাঁত পড়ে যাবে! সব হবে সুটিং-এর পর।

অভিনয় করার আগেই বিখ্যাত হয়ে ওঠে রামগোবিন্দ। নকল দাঁতের গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠে ষ্টুডিও অঞ্চল। গুণ্ডা যে সত্যি একটা রেকর্ড করবে—সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না কারো।

হঠাৎ একসময় পরিচালক মশাই ওর দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠেন। একি! ঘামে তোমার সব মেকাপ যে উঠে যাচ্ছে! এই দারুণ রোদ্দুরে সারা ষ্টুডিও বুঝি লাটিমের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ? এইবার গুণ্ডার সিন্ নেয়া হবে। যাও—যাও আবার নতুন করে মেকাপ নিয়ে এসো—

রামগোবিন্দের মাথায় যেন আচমকা আকাশ ভেঙে পড়ে! তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রূপ-সজ্জাকরের ঘরে। সে বেচারী ফ্যান খুলে দিয়ে মহানন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে! অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হলে যা হয়, তাই হল। প্রথমটা সে ভারী চটে গেল,—

তারপর মুখখানাকে গোম্‌রা করে আবার রামগোবিন্দের মুখ নিয়ে পড়ল।

এদিকে ফ্লোরে আবার অঘটন ঘটল।

বিরাট গাড়ী করে প্রযোজকমশাই এসে হাজির।

কোথায় তিনি টি-পার্টির আয়োজন করেছেন—নায়িকাকে তাঁর সঙ্গে তক্ষুনি যেতে হবে।

পরিচালক মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, পনেরো মিনিট অপেক্ষা করুন স্যার—এইটি নায়িকার মৃত্যু-দৃশ্য। গুণ্ডা সাজতে গেছে—এলো বলে।

প্রযোজক চটে-মটে উঠে ফতোয়া জারি করলেন, আমার আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার যো নেই। নায়িকাকে মারতে চান—ভালো কথা, কিন্তু আগে মেরে রাখেন নি কেন? আমি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম আপনাকে! গাড়ী চাপা দিয়ে মারুন, হোঁচট্‌ খাইয়ে মারুন, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাক্—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরুক···মোট কথা এসব গণ্ডগোল ব্যাপার আগেই করা উচিত ছিল। এখন আর আমি এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবো না। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সব অপেক্ষা করছেন।

নিরুপায় পরিচালক চারদিকে তাকান।

হঠাৎ বলে ওঠেন, ইউরেকা! হয়েছে। নিজের চুলে ফাঁস লাগিয়ে মরবে নায়িকা! কুইক্!

নায়িকাও টি-পার্টিতে যাবার জন্যে তৈরী হয়েই আছেন! কাজেই চুলে ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে তার এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না।

ক্যামেরাম্যান সবে তার হাতল ছেড়েছেন···এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ফ্লোরে এসে ঢুক্‌লো—নতুন মেকাপ করা রামগোবিন্দ ! কিন্তু তখন গুণ্ডার প্রয়োজন ছবি থেকে একেবারে ফুরিয়ে গেছে !

তাকে ধাক্কা মেরে এক পাশে হটিয়ে দিয়ে প্রযোজক নায়িকাকে নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলেন।

রামগোবিন্দ শুধোলে, তাহলে আমার অবস্থা ?

পরিচালক বল্লেন, নেকষ্ট্‌ পিক্‌চারে তোমায় আমি সুযোগ দেবো, —ভেবোনা তুমি ! সে মরিয়া হয়ে বল্লে, তাড়া করবো নাকি লোকটাকে ? গুণ্ডার অসাধ্য কিছুই নেই—!

পরিচালক তার হাত ধরে বল্লেন, তার চাইতে হোটেল থেকে ভালো ডেভিল এসেছে—তাই খাও—।

রামগোবিন্দ দুই চক্ষে অগ্নি বর্ষণ করে বেরিয়ে গেল ! তার চোখের ভাষা হচ্ছে এই যে, গুণ্ডার পার্ট সিনেমায় করতে পারল না বটে—রাস্তায় জল-জ্যান্ত সেই ভূমিকাতেই অভিনয় করবে সে !

—আর সে পার্ট হবে সত্যি রিয়ালিষ্টিক্‌ !

মেকাপ-ম্যান ভয়ে ভয়ে বল্লে, চিত্রতারকা ত' নয়—আসল তাড়কা !
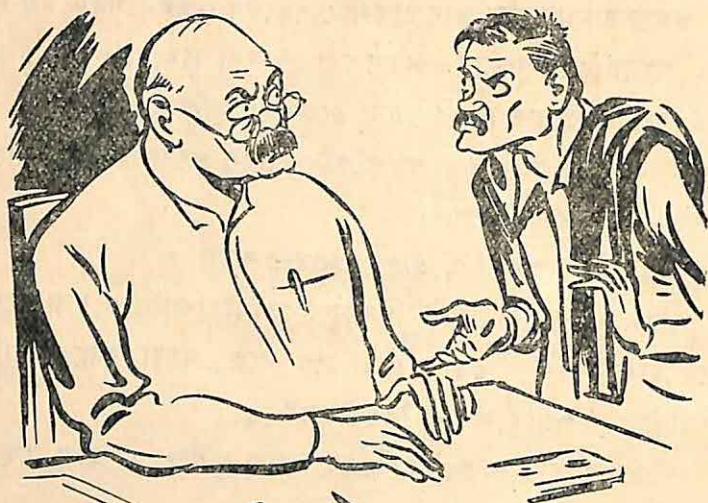
ড্রপ ওঠার আগে

[নাটমঞ্চে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন-রজনী। নতুন নাট্যকার, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী জয়মালা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন বলে প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। যবনিকা উত্তোলিত হবার কয়েক মিনিট আগে আমাদের নাটকের সুরু এবং ড্রপ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকের শেষ। একে আপনারা পাঁচ মিনিটের নাটকও বলতে পারেন]

[স্থান—থিয়েটারের ম্যানেজারের কামরা]

—ম্যানেজার—

ওরে, কে আছিস্…খবর নে, জয়মালার সাজা শেষ হয়েছে কি না! না হয় জোরে আর একটা কন্‌সার্ট দিয়ে থার্ড বেল বাজিয়ে দিতে বল্!

(ছুটে মেক্-আপ-ম্যানের প্রবেশ)

সর্বনাশ হয়ে গেছে ম্যানেজারবাবু !

—ম্যানেজার—

কি পাগলের মতো যা-তা কথা বল্‌ছিস্ ! আজ নতুন নাটকের শুভ উদ্বোধন-রজনী, আর বল্‌ছিস কিনা সর্বনাশ হয়ে গেছে !

—মেক্-আপ-ম্যান—।

আজ্ঞে, প্রথম দৃশ্যেই নায়িকার হীরের ব্রোচ্ পরার উল্লেখ আছে। নায়িকা, জান্‌লা গলিয়ে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ সেটা নায়কের হাতে ছুঁড়ে দেবে।

—ম্যানেজার—

বেশ ত' "বিজ্‌নেস্ ম্যানেজারকে" ত একটা নকল হীরের ব্রোচ আন্‌তে বলে দিয়েছি।

—মেক্-আপ-ম্যান—

তা হলে আর গোল কিসের স্যার ! বিজ্‌নেস ম্যানেজারের কোন দোষ নেই ! তিনি ঠিক "পিস্‌গুড্‌স্" জোগাড় করে রেখেছেন।

—ম্যানেজার—

তবে আট্‌কাচ্ছে কোথায় শুনি ?

—মেক্-আপ-ম্যান—

আজ্ঞে, জয়মালা নকল হীরের ব্রোচ্ পরবেন না ··· গোঁ ধরেছেন ! ওদিকে কনসার্ট ওয়ালাদের বাজাতে বাজাতে হাতে খিল ধরে গেল ! ড্রপ কিছুতেই উঠ্‌তে পারছেনা স্যার ! এখন যা হয় একটা বিহিত করুন !

—ম্যানেজার—

তাইত! আসল হীরের ব্রোচ! আমায় বিক্রী করলেও জোগাড় হবেনা! আজ বাদে কাল আর্টিষ্টদের মাইনে দিতে হবে। এই নতুন নাটকে কিছু পাওয়া যাবে সেই ভরসা!

—মেক্-আপ-ম্যান—

তা'হলে কি হবে স্যার? মেক্-আপ বন্ধ রাখবো?

—ম্যানেজার—

(চটে উঠে) মেক্-আপ! এখন চুন আর কালি নিয়ে এসে আমার দু'গালে মাখিয়ে দাও! যাও…যা‥ বল্‌ছি…

[সভয়ে মেক্-আপ-ম্যানের প্রস্থান আর শাল্মলী তরফদারের প্রবেশ]

—শাল্মলী—

আজ যে খুব বিক্রী করেছ ম্যানেজার! দুটো ফাউল কাট্‌লেটের অর্ডার দাও দেখি!—

—ম্যানেজার—

আমায় চটিওনা বিশাল-শাল্মলী তরু! মন-মেজাজ ভালো নেই!

—শাল্মলী—

সেকি হে ম্যানেজার! বাইরে "হাউসফুল" টাঙানো…তবু তোমার মুখে হাসি নেই। (গীতার সুরে) বিরস বদনে, আনমনে বসিয়া একাকী। কি হয়েছে জীবন-বল্লভ?

—মুখ বাড়িয়ে মেক্-আপ-ম্যান—

আজ্ঞে, মহা বিপদ! জয়মালা নকল হীরের ব্রোচ পরতে চাইছেনা—ড্রপও উঠ্‌ছেনা!

—শাল্মলী—

(মহা উৎসাহে) সে কথা আগে বল্‌তে হয়! আমি রয়েছি কিসের জন্য! ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমি, সে কথা তোমরা ভুলে বসে থাকো ··! ভয় নেই! আমার সঙ্গে গাড়ী রয়েছে। (যেতে যেতে ফিরে এসে) ভাই, ষ্টেজের ওপর কথাটা "অ্যানাউন্স" করে দিও। আমি নিজে জয়মালাকে ব্রোচ পরিয়ে দেবো।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

—ম্যানেজার—

(আপন মনে) এঃ! দাতা বলীরাজ এলেন আর কি! যখন বল্লাম, কিছু টাকা ফাইনান্স করো, 'ষ্টেজ'টাকে ভালো করি···জবাব দিলে, আমার টাকা কোথায়! এখন ছুটলেন হীরের ব্রোচ কিন্‌তে! হাম্বাগ!

—মেক্‌-আপ-ম্যান—

যাক্‌! বিপদ ত' কেটে গেল। আপনি আর ওঁর সঙ্গে চটাচটি কর্‌বেন না যেন স্যার!

—ম্যানেজার—

উনি আবার এলেন আমায় উপদেশ দিতে। যাও, জয়মালাকে গিয়ে বলো যে, হীরের ব্রোচই আস্‌ছে। কি আহাম্মুকীই করেছিলাম থিয়েটার খুলে! এর চাইতে কয়েক বিঘে জমি নিয়ে গাই-বলদ দিয়ে চাষ-আবাদ করলে আখেরে কাজ দিত। চাই কি সরকারী সাহায্যও পাওয়া যেত!

[মেক্‌-আপ-ম্যানের প্রস্থান, কিছুক্ষণ বাদে হলধর হালদারের প্রবেশ]

—হলধর—

এই নিন্ স্যার, আপনার বাবরী চুল, আর এই রইল আপনার নায়কের পোষাক। আমি চল্লাম!

—ম্যানেজার—

(ব্যস্ত হয়ে) কেন, কেন, তোমার আবার কি হ'ল হলধর ?

—হলধর—

আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি স্যার ?

—ম্যানেজার—

(কাষ্ঠ-হাসি হেসে) —না—না ! দিব্যি কার্ত্তিকের মতো চেহারা তোমার, তুমি বানের জলে ভেসে আসবে কেন ?

—হলধর—

কিন্তু কার্ত্তিক-চেহারায় ত' কুলোচ্ছে না স্যার। আর জন্মে যেন আর কিছু হয়ে জন্মাই···।

—ম্যানেজার—

আহা ! চট্‌ছ কেন ? কি হ'ল তাই বলনা !

—হলধর—

প্রথম কথা—পোষ্টারে নায়িকার চাইতে আমার নামের টাইপ ছোট কেন ? নায়ক বড়ো—না নায়িকা বড় ? এটা বাঙ্‌লা দেশ ! এখনো আমেরিকা হয়ে ওঠেনি ! তা' ছাড়া আপনি নাকি জয়মালাকে হীরের ব্রোচ দিচ্ছেন ? তবে আমিই বা হীরের আংটি পাবোনা কেন শুনি ?

—ম্যানেজার—

সে সব বিবেচনা পরে করা যাবে। আর নাম? আগে উদ্বোধন-রজনী উৎরে যাক্…তারপর তোমার নামাবলী দিয়ে আমি কল্‌কাতার রাস্তায় দেয়ালগুলি ঢেকে ফেলে দেবো।

[ছুটতে ছুটতে শাল্মলীর প্রবেশ]

—শাল্মলী—

এই যে ভাই ম্যানেজার, দেখো, হীরের ব্রোচটা জয়মালার পছন্দ হবে কিনা! দেখে নিও, খেলো জিনিষ আমি কাউকে দিই না!

—হলধর—

ও। হীরের ব্রোচটা আপনিই জয়মালাকে দিচ্ছেন! তা' হলে অবশ্য…

—শাল্মলী—

হেঁ—হেঁ! আপনি হচ্ছেন কলার সাধক। বুঝ্‌তেই ত' পাচ্ছেন সব। ষ্টেজে দাঁড়িয়ে জয়মালা যে সব প্রেমের কথা শোনায় আপনাকে, সবই কিন্তু বলে আমাকে উদ্দেশ করে। আমি "রয়েল-বক্সে" বসে থাকি…দেখেন নি লক্ষ্য করে, মাঝে মাঝে আমার দিকে কেমন ভাবে তাকায়?

—হলধর—

(ম্যানেজারকে) তবে আর আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। কিন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে স্যার। নইলে আমি—

—ম্যানেজার—

ঠিক কথা বলেছ হলধর। আজ থেকেই তোমার একশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল। যাও, মনের আনন্দে কাজ করো গে!

—হলধর—

(উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে) মনের আনন্দ আস্‌বে কোত্থেকে স্যার! যখন বুঝি নায়িকার ওই সব জোরালো প্রেমের কথাগুলি একেবারে সাবানের ফ্যানার মতোই অন্তঃসারশূন্য…শুধু হাওয়াতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন কি আর প্রাণে আনন্দ আসে? যাক্ একশ টাকা মাইনে বৃদ্ধি! পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনাই লাভ!

[নকল চুল আর পোষাক তুলে নিয়ে প্রস্থান]

[নাট্যকার এতক্ষণ চুপচাপ ঘরের এক কোণে বসে-ছিলেন—এইবার তিনি একটু এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে বল্লেন]

—নাট্যকার—

সবাইকারই সব স্থবিধে করে দিলেন স্যার! আমার দিকে একবার ফিরে তাকাবেন না?

—ম্যানেজার—

(তাচ্ছিল্যের সুরে) আপনি আবার ড্রপ ওঠবার মুখে ঘ্যানর-ঘ্যানর সুরু করে দিলেন?

—নাট্যকার—

আজ্ঞে, মানে আমারই ত' নাটক—

—ম্যানেজার—

আপনার নাটক তাতে হয়েছে কি ?

.—নাট্যকার—

এই বল্‌ছিলাম কি—[আম্‌তা আম্‌তা করে] উদ্বোধন রজনীতে নায়িকা পেলো হীরের ব্রোচ, নায়কের হল মাইনে বৃদ্ধি, আর নাট্যকার নগদ কিছু পাবে না ?

—ম্যানেজার—

আপনি দেখি আমায় অবাক করলেন ! কাগজে কাগজে আপনার নাম ছাপা হয়েছে, পোষ্টারে বড় বড় টাইপে আপনার নাম লাল কালীতে ঝক্ ঝক্ করছে ...... এত কাণ্ডতেও আপনার মন উঠ্‌ল না ?

—নাট্যকার—

[কুণ্ঠিত হয়ে] এই মানে বল্‌ছিলাম কি ছেলেটা আজ এক মাস থেকে টাইফয়েডে ভুগ্‌ছে ! চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি নে ! ভেবে রেখেছি—উদ্বোধন রজনীতে যে টাকা পাবো তাই দিয়ে ইন্‌জেক্‌সন কিনে নিয়ে যাবো। ডাক্তার আমার বন্ধু—সে বসে রয়েছে !

—ম্যানেজার—

বসে থাক্‌লেই হল ? আপনার কি ধারণা যে, আমি এখানে দান-ছত্র খুলে বসেছি ?

—নাট্যকার—

কিন্তু টাকা ত' আমার পাওনা হয়েছে—ম্যানেজারবাবু! আমার নাটকটা যখন আপনারা অভিনয় করেছেন!

—ম্যানেজার—

অ্যাঁ! আপনি বল্‌ছেন কি মশাই? আপনার নাটক? আপনি যে মশাই রাতকে দিন করতে পারেন!

—নাট্যকার—

আপনার কথা ত' আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে ম্যানেজারবাবু!

—ম্যানেজার—

বুঝ্‌বেন কি করে বলুন? মলাটখানি ছাড়া আপনার নাটকে আর কি আছে শুনি?

—নাট্যকার—

অ্যাঁ! শুধু মলাট?

—ম্যানেজার—

হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুধু মলাট! নামটা যে দিয়েছি এই আপনার ভাগ্যি। যান্, নীচে গিয়ে অভিনয় দেখুন গে! ওরে হ... বাবুকে "স্পেশাল সিটে" বসিয়ে ঘণ্টা মেরে ড্রপ তুলে দিতে বল।

[যবনিকা]

—ইতি—